মুঘল আমলে খোজা

উপনিবেশপূর্ব রাষ্ট্র-সমাজে জেন্ডার ফ্লুইডিটি

সাজাহান আলি ।। বিশ্বেন্দু নন্দ

জ্ঞানগঞ্জ
উপনিবেশ-বিরোধী কর্পোরেট-বিরোধী চর্চা

মুঘল আমলে খোজা, উপনিবেশপূর্ব সমাজ-রাষ্ট্রে জেন্ডার ফ্লুইডিটি, সাজাহান আলি, বিশ্বেন্দু নন্দ
Mughol Amole khoja, UponibeshPurbo Somaj-Rashtre Gendar Fluidity, Sajahan Ali, Biswendu Nanda
প্রচ্ছদের ছবি - *উপনিবেশপূর্ব সময়ের প্রখ্যাত হাবসি খোজা মালিক অম্বর। ১৫৪৮এ ইথিওপিয়ায় জন্ম। চাপু নামে সেনা দাস হিসেবে বিক্রি হন। নিজাম শাহের আহমদনগরে পৌঁছে নিজামের বাহিনীর সেনাপতিতে উত্তীর্ণ এবং ১৬০০তে প্রধানমন্ত্রী। ১৬২৬এ মৃত্যুকাল পর্যন্ত আহমদনগর শাসন করেছেন। জাহাঙ্গীরের আমলে খুররম, আগামী দিনের সম্রাট শাহজাহানের বাহিনীর বিরুদ্ধে বেশ কয়েকবার বিজয়ী হন।* ছবিয়াল হাসিম। ভিক্টোরিয়া এন্ড এলবার্ট মিউজিয়াম।

১৭৭০/১১৭৬ গণহত্যা গবেষণা আন্দোলন ।। জনভাণ্ডার ।। অপ্রাতিষ্ঠানিক গবেষণা উদ্যম।। বই প্রকাশ পরিকল্পনা।। গ্রন্থাগার প্রকল্পের অধীনে জ্ঞানগঞ্জ।। উপনিবেশ-বিরোধী কর্পোরেট-বিরোধী চর্চা, ৪ হিদারাম ব্যানার্জী লেন, কলকাতা - ৯ পক্ষে প্রকাশনা করলেন বিশ্বেন্দু নন্দ, বহ্নিহোত্রী হাজরা, অত্রি ভট্টাচার্য

সম্পাদকমণ্ডলী বিশ্বেন্দু নন্দ, বহ্নিহোত্রী হাজরা, অত্রি ভট্টাচার্য, অর্ক ভাদুড়ি, মহুয়া লাহিড়ী, অর্ণব সাহা, জ্যোতি বন্দ্যোপাধ্যায়, ভবতোষ সরকার, সৌরভ গুহ, সুরজিৎ সেন, রক্তিম ঘোষ, মিলটন বিশ্বাস, সৈয়দ নকিব মাহমুদ, শাজাহান আলি, ছৈয়দ মোহাম্মদ মিনহাজুর রহমান, আল মারুফ রাসেল, জয়ন্ত ভট্টাচার্য

ছাপা, বাঁধাই আনন্দগোপাল হালদার, হিন্দমোটর, হুগলি

দাম ৬০ টাকা
প্রথম প্রকাশ পৌষ ১৪৩০, ডিসেম্বর ২০২৩
কপিরাইট নেই

ভূমিকার বদলে

আছে আদি মক্কা এই মানবদেহে
দেখনা রে মন ভেয়ে।
দেশ-দেশান্তরে দৌড়ে এবার
মরিস কেন হাঁফিয়ে॥

মঁসিয়ে ফুকো কথিত 'গর্ভনমেন্টালিটি'-র প্রতর্কটি সতেরশো শতকে বুর্জোয়া লিবারাল ইউরোপীয় রাষ্ট্রের উৎপত্তিকে সূত্রায়িত করেছিল। কিন্তু, এদেশের ধার্মিক রিচুয়াল-অধিকৃত মনুষ্য কো-অর্ডিনেটগুলিকে, তাদের মন-শরীরের একাত্মতার পারম্পরিক অভ্যাসগুলিকে (ধরা যাক, যোগ ও তন্ত্র) এখনও তার অসীম বিভিন্নতার কারণে, তৎকালীন রাষ্ট্রীয় কাঠামো আলোচনার প্রেক্ষাপটে সূত্রায়িত করা যায়নি। এগারো শতকের কাশ্মীরি-শৈব পরম্পরার গুরু ক্ষেমেন্দ্র কেন একইসঙ্গে জলদগম্ভীর ব্যাকরণশাস্ত্র, বিষ্ণুর অবতাররূপে বুদ্ধের ধরাধামে আগমনের 'ইতিহাস' রচনার পাশাপাশি মানুষের যৌননিরীক্ষণে, প্রেমভাবনায় 'তৃতীয় প্রকৃতি' তথা আজকের পরিভাষায় ক্যুইয়ার সত্তার প্রস্তাবনা দিচ্ছেন তা আমাদের ভিক্টোরিয়-ক্যাথলিক ছুৎমার্গের মনোজগতে, ভাব-পৃষ্ঠভূমিতে সহজবোধ্য নয়। এছাড়াও সুফি-বাউল ধারার তত্ত্বভাষ্যে যে প্রাতিষ্ঠানিকতার বিরুদ্ধে জেহাদ (উপরোক্ত লালন সাঁইয়ের পদটি তার ক্ষুদ্র প্রমাণ), তাকে ধরে আমরা সংক্ষেপে এই দাবি করতেই পারি- দেহসম্পর্কে, বাসনার প্রকাশ সম্পর্কে যে ধার্মিক চিহ্নকগুলি উপনিবেশের বহু আগে থেকেই ব্যবহৃত হচ্ছে, সেগুলি কেবলমাত্র কোনো গুহ্য অধ্যাত্মবাদী সংকেত নয়, বরং বৃহত্তর অর্থে তৎকালীন সমাজ-রাজনীতির দ্যোতক। ইউরোপীয় উপনিবেশতন্ত্রের আগমনের ফলে অ-ইউরোপীয়দের এই স্বাভাবিক, সহজাত সমাজ-পরিসরকেই প্রান্তে ঠেলে দেওয়া হল। উনিশ শতকের মধ্যেই ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শক্তি দমনমূলক আইন প্রণয়ন এবং 'সেকুলার' মধ্যবিত্ত নাগরিক নির্মাণের মাধ্যমে কোডভিত্তিক রাষ্ট্রকাঠামো তৈরী হতে শুরু করলো। ইন্দ্রানী চ্যাটার্জী When Sexuality Floated Free of Histories in South Asia প্রবন্ধে স্পষ্টভাবে বলছেন কীভাবে উপনিবেশিক কাঠামো সব কটা ধর্মের অভিজাত আর বড় চাষীদের একগামিতা, পিতৃতন্ত্র, বিষমকামিতার কাঠামো মেনে নিতে বাধ্য করে বয়স্কা মহিলাদের নেতৃত্বে চলা পারিবারিক কাঠামো ধ্বংস করে পরিবার নিয়ন্ত্রণের লাগাম পুরুষদের হাতে তুলে দিতে বাধ্য করল। একা মা, মামা-বাড়ি ইত্যাদি পরিবারের ধারণা তুলে দেওয়ার প্রবল চেষ্টা হল, এবং কীভাবে আইন করে পুরুষ উত্তরাধিকারী নিশ্চিত করে সমাজে পৌরুষ, শৌর্য আর মানসিক

দমন আর নির্দিষ্ট বৈধতার ধারণা তৈরি হল। অথচ জৈন মঠে পড়াশোনা করা ক্ষেমঙ্কর বলছেন পুরুষ-পুরুষ যৌন মিলনের সুবিধে হল মহিলাদের বুকের পুঁটুলির বাধা নেই, মাসিকের ঝামেলা নেই, পেট হওয়ার সমস্যা নেই।

১৮৫৭'র মহাবিদ্রোহের পরেই বিদ্রোহী আদিবাসী জনগোষ্ঠীগুলির গায়ে লাগলো 'ক্রিমিনাল ট্রাইবে' বা 'অপরাধপ্রবণ আদিবাসী' গোষ্ঠীর তকমা, ভারতবর্ষের ইসলামী শাসনকাঠামোর অন্দরে 'খোজাসারা'দের প্রামাণ্য উপস্থিতির ইতিহাসকে ভুলিয়ে দেওয়া শুরু হল। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকতা, একগামী দাম্পত্যকে আইনগত সুরক্ষায় সুরক্ষিত করলো। এবং অন্যান্য সমস্ত ধরনের যৌনসম্পর্ক, সমযৌনমিলন, ভাবগত বিমূর্ততা এবং জীবিকাকে অপরাধী করে তোলা হল। সর্বোপরি, 'লিঙ্গ এবং যৌনতা'কে সে বেঁধে ফেললো 'পুরুষ-নারী'র সীমায়িত দ্বিবাচনিকতায়। নারীসত্তার নির্মাণও ঔপনিবেশিক ঐতিহাসিকেরা করলেন যৌনতার নামগন্ধ ছেঁটে কেটে। সেই লুপ্তপ্রায় জ্ঞানকাণ্ডের সন্ধানেই এই পুস্তিকার অবতারণা। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকতার প্রকৃত উত্তরসূরি অধুনা হিন্দুত্ববাদীদের প্রধানতম কাল্পনিক শত্রু মুঘল যুগের ক্ষমতাকাঠামোতে খোজাদের স্থানাঙ্কনির্ণয়ের এই প্রকল্প, একটি পাল্টা রাজনৈতিক প্রকল্প। চর্চাদল যেহেতু শতফুল বিকাশের পক্ষপাতী, তাই এই পুস্তিকার সহলেখক বিশ্বেন্দু নন্দ যখন লেখেন 'শন মারমনের Eunuchs and Sacred Boundaries in Islamic Society বইএর সমালোচনায় আহমদ নাসের বলছেন অধিকাংশ পশ্চিমি পণ্ডিত কখনও সজ্ঞানে, কখনও অজানতে ইসলামিক সমাজ আর মুসলমান সমাজের মধ্যে পার্থক্য গুলিয়ে ফেলে হারেম, খোজা এমনকী সমকামিতা বিষয়ে অমুসলমান পাঠকের মনে ভুল ধারণা তৈরি করান - 'As such, Marmon does not distinguish between the Islamic society and the Muslim society. The first society is the one presented in the Quran and the Sunna which Muslim societies aspire to.' (Ahmad A. Nasr, EUNUCHS IN ISLAMIC SOCIETY')।

তখন, চর্চাদলের আরেক ভাষ্যকার- ওপার বাংলার তরুণ গবেষক তাহমিদাল জামি লিখলেন- 'এখানে সেমান্টিক তথা পরিভাষা ও অর্থগত প্রশ্ন এবং পদ্ধতিগত প্রশ্ন দুইটাই বিবেচ্য। মুসলিম বনাম ইসলামিক কিংবা ইসলামিক বনাম ইসলামিকেট ইত্যাদি বিভাজন করাই যায় এবং তা অর্থপূর্ণও হতে পারে - কিন্তু যদি ধরে নেওয়া হয় যে ইতিহাসের নানা মুসলমান সমাজের বাইরে ইসলামি সমাজ খুঁজতে হবে তাইলে সেটা ইসলামি সমাজকে একটা আইডিয়াল টাইপে বা এসেনশিয়ালিজমে পর্যবসিত করে। যেসকল সমাজে হেরেম, খোজা, ইত্যাদি ছিল সেখানেও একইসঙ্গে শরিয়াহ, ফিকহ, সহ ইসলামের নানা প্রকরণের আমল বিলক্ষণ ছিল। ফলে সেগুলোকে একচুয়ালি এক্সিস্টিং ইসলামি সমাজের নমুনা যদি কেউ বলে (একচুয়ালি এক্সিস্টিং সোশালিজম

শব্দবন্ধের আদলে) তাতে খুব ভুল হয় বলে মনে হয় না। খোদ আদি ইসলামি তথা প্যালেও-ইসলামিক সমাজের অর্থাৎ সাহাবা-তাবেয়ীদের যুগের সমাজেরও গভীরতর এন্থ্রোপলজিকাল রিকনস্ট্রাকশন করলে সেটা ঠিক আইডিয়াল টাইপের মতো নাও হতে পারে। ইসলামি সমাজের এসেনশিয়ালিস্ট ধারণা আদতে একটা স্যাক্রেড বা ট্রান্সেন্ডেন্টাল স্ট্রাকচার। আমার মনে হয়, ইতিহাসের কাজ নয় সেই এসেনশিয়ালিজমকে হাজির করা। ইতিহাস তো খোদ প্রফেটিক টাইমকেও বিষয় আকারে নানা জটিলতা সহকারেই বিচার করবে। সিরাত, সুন্নাহ আর ইতিহাস প্রকরণ আকারেই আলাদা।'

এই প্রতর্ক দীর্ঘজীবী হোক।
উপনিবেশ-পূর্ব সময়ের ভাবকাঠামোকে সমাজকাঠামো হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করার লড়াই জারি থাক।

ধন্যবাদান্তে
অত্রি ভট্টাচার্য

খোজাদের খোঁজে

সাজাহান আলি, বিশ্বেন্দু নন্দ

বেশ কয়েক বছর আগে নবাবি এবং মুঘল আমলের খোজাদের উদ্ভব, সামাজিক থাকবন্দীতে তাঁদের অবস্থান খুঁজতে গাভিন হাম্বলি, শাদাব বানোদের মত গবেষকের লেখাপত্র থেকে খসড়া প্রবন্ধ তৈরি করি। ঘটমান বর্তমানের ৬ নম্বর পুথির ভূমিকা লেখক, অত্রি ভট্টাচার্য'র বন্ধু, স্নাতকস্তরে সমাজত্ত্ব পড়ুয়া সাজাহান আলি তৃতীয় লিঙ্গ, খোজাদের নিয়ে গবেষণার উৎসাহ দেখান। আমার খসড়া প্রবন্ধ অবলম্বনে তিনি কাজ শুরু করে, সেটিকে সাজালেন নতুন করে। তাঁর বাংলা লেখার ইন্টারেস্টিং আঙ্গিকটি আমার তো বেশ ভালই লেগেছে। অত্রি ভট্টাচার্য, সাজাহান আলি বা বহ্নিহোত্রী হাজরার মত নতুন সময়ের গবেষকেরা তাঁদের লেখার আঙ্গিক এবং খোঁজে যে নিজস্বতার ছাপ ফেলছেন তার প্রমান এই নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধ।
উপনিবেশবিরোধী চর্চার জয় হোক। উপনিবেশের পতন হোক।

বিশ্বেন্দু নন্দ

খোজাদের অস্তিত্ব খুঁজতে গিয়ে আমরা উপনিবেশের আগের সময়ে তাঁদের সামাজিক অবস্থান কী ছিল, মূলতঃ এই বিষয়টা বোঝার উদ্যম নিয়েছি, তার সঙ্গে প্রবন্ধের শেষে ছুঁয়ে গিয়েছি উপনিবেশ এবং তার পরের যুগে খোঁজা সমাজের পরিণতিটি।

খোজা শব্দের সঙ্গে আমি, সাজাহান আলির প্রথম পরিচয় ক্লাস টেনে, সিরাজদ্দৌলা নাটক সূত্রে। নাটকের একটি চরিত্রের নাম পীদ্রুপ এবং সে ছিল খোজা। গোটা নাটকে এই চরিত্রের ভুমিকা ছিল একটিই, শুধুই বার্তা আদানপ্রদান। বোঝাই যাচ্ছে ঘটনাবলী প্রভাবিত করতে খোজা চরিত্রটির গুরুত্ব নাটকটিতে ছিল না বললেই চলে। ফলে সেই বয়সে আমার মত পড়ুয়ার কাছে খোজা শব্দটা হয়ে যায় খোরাকের সুত্র। মজার বিষয় হল, স্কুলজীবনের পড়াশোনা জগতে খোজাদের অস্তিত্ব আর ছিলই না। ভাববার বিষয়, একটি লিঙ্গের অস্তিত্ব পাচ্ছি সিলেবাসের একটিমাত্র টেক্সটে যা-আবার সিরাজউদ্দৌলার দরবারে। অথচ বাসে-ট্রেনে মাঝেমাঝেই হিজড়েদের দেখতে পেলেও, সিলেবাসে তাদের অস্তিত্ব থাকে না।

পাঠকদের জন্য একটি প্রশ্ন, শুরুতেই পেশ করছি। কোন যুগকে আপনারা আধুনিক ও প্রগতিশীল বলবেন? ক) যে যুগে ট্রান্সজেন্ডার মানুষদের নগর প্রশাসন পরিচালনা, সামরিক বাহিনীর নেতৃত্বের দায়িত্ব দেওয়া হত, রোজগারের জন্যে বিশাল আকারের জায়গিরও দেওয়া হত; খ) যেই যুগে ট্রান্সজেন্ডার মানুষদের মিছিল আন্দোলন করতে হয় নাগরিকত্ব পাওয়ার জন্যে, সম্পত্তির অধিকার পাওয়ার জন্য। আপনার উত্তর পাওয়ার আশায় থাকলাম।

পাঠকদের অবাক করব এই তথ্য জানিয়ে যে প্রথম যুগটির কথা ওপরের স্তবকে উল্লেখ করলাম, সে যুগে শাসন ক্ষমতার থাকবন্দীর প্রায় প্রত্যেক স্তরে শাসক ছিলেন

মুসলমানেরা। অবাক কাণ্ড, কারন পশ্চিমের দেশগুলিতেও দেখা যাচ্ছে ট্রান্সজেন্ডার বিরোধী মিছিলগুলির প্রথম সারিতে রয়েছে মুসলমানেরা। এও কী পশ্চিমের তৈরি মানসিকতা? একটি মজার ঘটনা বলি। গত রমজানে ইন্সটাগ্রাম রিলসে মরক্কোর কয়েকটি মসজিদের ভিডিওতে লাইক দেওয়ার পর বউ পেটানো কেন জায়েজ সেসব রিলস আসতে শুরু করে। অর্থাৎ গোটা প্রকল্পটাই একটা কন্সট্রাক্ট। তবে সে আলাপ অন্য কোন দিনের জন্য তোলা থাকল। আজকের আলোচনা শুধু খোজাদের নিয়ে।

খোজাদের নিয়ে কথা বলা শুরু করার আগে মুঘল আর মুঘল সাম্রাজ্য বিষয়ে কিছু তথ্য জেনে নেওয়া যাক। জেনে নেওয়া যাক, মুঘলদের শাহী জীবনে আর শাসন ব্যবস্থায় লিঙ্গ রাজনীতি, আজকে যাকে জেন্ডার পলিটক্স বলি, তার ভূমিকা কী ছিল।

পিতৃতন্ত্র বলতে আমরা আজ, জাতিরাষ্ট্রের আমলে যে ধারণাটা বুঝি, সে সময়ে তাঁর সংজ্ঞা ভিন্ন ছিল। উপনিবেশপূর্ব সময়ের নারীদের কর্মকাণ্ডের স্বরূপ দেখলে একটি ইংরিজি শব্দবন্ধ মাথায় আসে, 'ahead of its time'। সুলতানি যুগে শাসন ক্ষমতায় থাকা রাজিয়া থেকে শুরু করে মুঘল আমলে নূর জাহান বা জাহানারার কৃতিত্ব বাখান অন্য কোনও সময়ে আলোচনার জন্য তোলা রইল। আজ আমরা কয়েকটি ঘটনার উদাহরণ উল্লেখ করে গোটা বিষয়টাকে অন্য দৃষ্টিকোণে দেখার, বোঝার চেষ্টা করব।

মুঘল আমলের শুরুর সময়ে মহিলাদের খোলামেলা জীবনের একটা বড় কারন ছিল মধ্য এশিয়দের যাযাবর জীবনযাপন। শাদাব বানোর প্রবন্ধ থেকে জানতে পারি ইবনে খালদুনের সরাসরি ছাত্র কায়রোর মামলুক সময়ের ফাতিমি সময় নিয়ে কাজ করা ইতিহাসবিদ আল মারকিজি, সুলতান আল সালেহ ইমাদুলদিন ইসমাইলের গৃহস্থ জীবন বিষয়ে বলছেন, 'তিনি মাঝেমধ্যেই ২০০ মহিলার দল নিয়ে আক্কাডিয়া ঘোড়ায় চড়ে প্রাসাদ থেকে আনন্দ বিহারে বেরোতেন [বলা জরুরি, খোজাদেরও সেই আনন্দ বিহারে সঙ্গে নিতেন]। সম্রাটের প্রিয় স্ত্রীরা আরবি রেশমের কামিলিয়া (একধরনের আলখাল্লা) পরে ঘোড়ায় চড়ে একে অপরকে তীব্র গতিতে পাল্লা দিত। কখনও তারা ঘোড়ায় চড়ে পোলো খেলত। এই সময় পর্দা প্রথা কঠোর ভাবে মানা হত না।'

মধ্য এশিয়ার মুঘল হারেম নিয়ে সাহিত্য ও মিনিয়েচার ছবি ইত্যাদি সুত্র থেকে একটা কথা বলাই যায়, মুঘল হিন্দুস্তানের মত সেখানে তীব্র পুরুষ-স্ত্রী বাসস্থানের বিভাজন ছিল না। বাবরনামার ছবিগুলো থেকে পুরুষ-স্ত্রীর যৌথ মেলামেশার উদাহরণ পাওয়া যায়। বাবরের কন্যা গুলবদন বেগমের লেখা থেকে জানা যায়, বাবরের কাবুলের হারেম ছিল অনেক খোলামেলা; মহিলাদের মুখ ঢাকতে হত না, তারা ঘোড়ায় চড়তেন, চড়ুইভাতিতে যেতেন, শিকার শিবিরে সক্রিয় অংশ নিতেন এবং ঘোড়ায় চড়ে তীরন্দাজিতে মাহির ছিলেন, প্রকাশ্যে যৌথ মদ্যপানের আসরে অংশ নিতেন। মুঘল সাম্রাজ্যের প্রথম দিকে মহিলারা অনেকটাই মুক্ত জীবনযাপন করতেন। স্বাভাবিকভাবেই এই সময়ে

মহিলাদের নিয়ন্ত্রণে খোজাদের ব্যাবহার করা হয়েছে। স্বাভাবিক কেন বলছি, সেই প্রসঙ্গে পরে আসছি।

'বাবরনামা' বই চিত্রণে ছবিতে দেখা যায় বাবর, তাঁর বড় দিদি খানজাদা বেগমের সঙ্গে বৈঠক করেছেন বহু পুরুষ, আমীর, অভিজাত, পুরুষ-স্ত্রী ভৃত্য নির্বিশেষে সবাইকে সঙ্গে নিয়ে। খানজাদা বেগমের সময়ের আগে, বাবর এবং অন্যান্য পুরুষ সঙ্গীর সাথে বসে, বাবরের শিবিরে হুলহুল আনিকা নামের এক মহিলার মদ্যপান করার ঘটনার কথা জানা যায় 'বাবরনামা'য়। রুবিলাল 'নুরজাহান' বইতে লিখছেন- 'In 1519, when Babur the first Mughal, was camped with his cavalcade near Kabul, a woman named Hulhul Anika, a member of royal entourage, visited his tent and had a drink with Babur and his men.' এপ্রসঙ্গে বলে রাখা দরকার, হুমায়ুন যখন শের শাহের কাছে যুদ্ধে হেরে পলাতক, সে সময় তাঁর ভাবী স্ত্রী প্রবাসকালে হুমায়ুনের পাঠানো বিবাহ প্রস্তাব অস্বীকার করেন এই মর্মে যে তিনি এমন এক মানুষকে বিয়ে করতে চান, স্বচ্ছন্দে যার গলবন্ধনী তাঁর হাত ছুঁতে পারবে।

হুমায়ুনের বোন, গুলবদন বেগম শাহী পুরুষ প্রতিনিধি ছাড়াই জেনানা মহলের ২০০ জন মহিলাকে নেতৃত্ব দিয়ে হজ্ব করতে যান। আকবরের অনুরোধে গুলবদন বেগম হুমায়ুনের স্মৃতিকথা 'হুমায়ুনামা'য় লিখলেন, মহিলাদের জেনানায় আলাদা করে রাখাই মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের কারন হবে।

'আকবরনামা'র একটি ছবিতে দেখা যায় শিশু আকবর আর তাঁর থেকে কিছু বড় ইব্রাহিম মির্জার মধ্যে কুস্তি লড়াই চলছে, কামরান মির্জা পাশে দাঁড়িয়ে আছেন। মজার বিষয় হল, এই টানটান হাইপার ম্যাস্কুলিন এক ঘটনার সাক্ষী হচ্ছেন এক মহিলা, যিনি ঘটমান বর্তমানে, কুস্তি আসরের একদম মধ্যিখানে দাঁড়িয়ে। এই মহিলার নাম খানজাদা বেগম, মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা সম্রাট বাবরের বড় বোন।

আকবরের শসনকালেই মুঘল সাম্রাজ্য, শাহী জেনানার মহিলাদের স্বাধীন এবং অনিয়ন্ত্রিত চলাচলের ওপর কড়া নিয়ন্ত্রণ কায়েম করল। যদিও অন্তঃপুরে থাকা শাহী মহিলাদের রাজনীতি মুঘল রাজনীতি, শাসন ব্যবস্থা, নীতিমালা তৈরিতে বিপুল প্রভাব যে ফেলেছে তাঁর বিশদ উদাহরণ পাচ্ছি এলিসন ফিল্ডলি, রুবিলাল, সোমা মুখোপাধ্যায়, অড্রে টড়ুস্কে, ইরা মুখুটি, মুনিস ফারুখি এবং অন্য গবেষকের ব্যতিক্রমী লেখাপত্রে।

মুঘল সাম্রাজ্যের খোজা নীতি বিষয়ে আলোচনা শুরু করার আগে, সে সময়ে ক্ষমতার থাকবন্দীতে শাহী মহিলাদের অবস্থা বিষয়ে জানা জরুরি, কারণ খোজাদের সঙ্গে মহিলাদের আন্তঃসম্পর্ক ভীষণভাবে জড়িয়ে রয়েছে। ধর্মে মুসলমান শাসক বলতে যদিও অনেকেরই ধারণা যে তারা ধরে ধরে মহিলাদের কচুকাটা করতেন, সেই ধারণা ভাঙতেই এতগুল কথা বললাম। আমি যেমন মুঘল শাসকদের নারীবাদীও আখ্যা দিতে চাই না, তেমনি তাদের যেভাবে জনপ্রিয় কৃষ্টির নানান ক্ষেত্রে, যেমন বলিউডি সিনেমায়

নারীবিদ্বেষী মানসিক রোগী হিসেবে দেখানো হয়, সেটা যে তারা ছিলেন না, একথাটাও আমাদের আজ স্পষ্টভাবে আজ বলার সময় এসেছে। অন্তত শুরুর দিকের মুঘল আখ্যানগুলোতে মহিলাদের খোলামেলা জীবনযাপনের নানান উদাহরণ পাচ্ছি, যার প্রধান কারণ হল তাদের যাযাবরি পরম্পরা। বছরের বেশিরভাগ সময়টাই সমাজের অধিকাংশ সদস্য জীবন কাটাত ঘোড়ার পিঠে চেপে। এক অঞ্চল থেকে আরেক অঞ্চলে যাওয়ার সময়ে মহিলাদের এক জায়গায় রেখে যাওয়াটাও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় ছিল না, একথা মুঘলরা মানত। এবং মহিলারাও এই ধরনের জীবনশৈলী আয়ত্ত্ব করেছিল। সেখান থেকেই ইসলামের পর্দাপ্রথাকে কঠোরভাবে না মানার বিষয়টি চোখে পড়ে। এছাড়াও যাযাবর জীবনযাপনে মহিলাদের বাধ্যতামূলক ঘোড়ায় চড়া শিখতে বাধ্য করে। তৈমুরী-চেঙ্গিজি পরম্পরায় মহিলাদের সক্রিয় ভূমিকা ছিল। চেঙ্গিজ খানের কন্যাদের নিয়ে বিশদে জানতে, পাঠকদের জ্যাক ওয়েদারফোর্ডের 'দ্য সেক্রেড হিস্ট্রি অব মঙ্গোল কুইনসঃ হাউ দ্য ডটার্স অফ চেঙ্গিজ খান রেসকিউড হিজ এম্পায়ার' বইটা পড়ার অনুরোধ পেশ করলাম।

ফলত বলাই যায়, প্রথম দিকের মুঘল যুগের মহিলারা সমান অধিকারের অধিকারিণী না হলেও ডাইনি অপবাদে একের পর এক মহিলাকে পুড়িয়ে মারা ইওরোপের তুলনায় বেশ কিছু সামাজিক ও অন্য কিছু ক্ষেত্রে রাজনৈতিক হকের মালকিন হয়েছিলেন। এই ছিল সেই সময়ের মুঘল দরবারের আগের সময়ের লিঙ্গ কাঠামো (Gender Structure)।

এবার আসা যাক খোজা প্রসঙ্গে।

খোজা শব্দটির উৎপত্তি ফারসি ভাষা থেকে। পুরুষ ও মহিলার বাইরের লিঙ্গ খোজা হিসেবে পরিচিত। বর্তমানের LGBTQIA+ সমাজের Transgender বা Non-binary মানুষের সঙ্গে সাদৃশ্য থাকলেও তারা সম্পূর্ণ এক নয়। বর্তমান যুগে একটা সময়ের পর মানুষ তাদের নিজেদের দ্বারা অর্পিত লিঙ্গের পরিচয়ে আত্মপ্রকাশ করে যা ইংরিজিতে Come Out হিসেবে পরিচিত। কিন্তু সেযুগে কেউ খুব একটা স্বেচ্ছায় খোজা হত না বলেই ঐতিহাসিক উপাদানগুলি প্রমাণ দেয়। যা জানা যাচ্ছে সেযুগে স্ব-ইচ্ছেয় বালকেরা খোজা হত না (ব্যাতিক্রম উদাহরণও বেশ কিছু রয়েছে, যেমন আমীর শাহ কুলি)। খোজাদের প্রকারভেদ আলোচনা করার পূর্বে ইসলাম পূর্ব দক্ষিণ এশিয়ার খোজাদের বিবরণ দেখে নেওয়া যাক।

পৌরাণিক যুগ থেকেই খোজাদের বেশ চাহিদা ছিল উপমহাদেশ জুড়ে। মনুর স্মৃতিশাস্ত্র পরিষ্কার ভাষায় খোজা/হিজড়েদের জন্যে উদ্দিষ্ট বেশ কয়েকটা কাজের উল্লেখ করেছে। আর পি কাংলের অনুবাদে 'অর্থশাস্ত্র'তে খোজাদের জন্যে নির্দিষ্ট বিভিন্ন ধরনের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের বিস্তর আলোচনা রয়েছে। সোমদেবভট্টর 'কথাসরিত সাগর' খোজাদের অস্তিত্ব জানান দিচ্ছে। শান্তিনিকেতনের ছাত্র হাজারিপ্রসাদ দ্বিবেদীর 'বাণভট্ট কী আত্মকথা', প্রিয়নাথ সেনের অনুবাদে 'বাণভট্টের আত্মকথা'য় বেশ বিশদে কঞ্চুকিদের

নিয়ে বিশদ আলোচনা করেছে। কঞ্চুকিরা রাজকীয় অন্তঃপুরের সম্মান রক্ষা আর পাহারার কাজে নিযুক্ত থাকতেন এবং তাঁরা প্রত্যেকেই ক্ষমতার থাকবন্দীর প্রত্যেক স্তরে সম্মানিত হতেন। এছাড়াও পুরাণগুলো ঘাঁটলে পুরুষ আর মহিলার বাইরের অন্য লিঙ্গের মোটামুটি সরব অস্তিত্বের বেশ কিছু রেফারেন্স পাওয়া যায়। মহাভারতে এই প্রসঙ্গে অর্জুনের বৃহন্নলা বেশ ধারণ উল্লেখযোগ্য সূত্র।

দক্ষিণ এশিয়ার বাইরেও বেশ কিছু সাম্রাজ্যে খোজা/হিজড়েদের অস্তিত্বের ঐতিহাসিক রেফারেন্স পাওয়া যায়। নাদিয়া মারিয়া এল শেখের লেখায় আব্বাসি দরবারে খোজাদের নিয়ে বেশ কয়েকটি তথ্য পাওয়া যায়। খোজাদের মূল কাজ ছিল হারেম বা জেনানার অভিভাবকত্ব এবং সেই সূত্রে তাঁদের সামাজিক সম্মানের উদাহরণ পাওয়া যায়। এক অর্থে তাঁদের কাজ ছিল সাম্রাজ্যের আব্রু ও ইজ্জৎ রক্ষা করা। আব্বাসিদ খিলাফতে ব্যক্তি খোজা নিয়ে হিউ কেনেডি বাগবিস্তার করেছেন। মু'নিস আল মুজাফফার ছিলেন আব্বাসিদ খলিফতের সেনা সর্বাধিনায়ক। তিনি আদতে বাইজেন্টাইন গ্রীক খোজা দাস। তাঁর নেতৃত্বে আরব সেনাবাহিনী বেশ কয়েকটি যুদ্ধে জয়লাভ করে এবং তিনি বেশ প্রতিপত্তি ছড়িয়ে জীবন কাটিয়েছেন। চিনের খোজারা প্রধানত সামরিক কাজে নিযুক্ত থাকত এবং সন্তান দত্তক নিয়ে তাঁরা সম্মানীয় জীবন যাপন করত। ওসমানিয় সাম্রাজ্যে খোজাদের সম্মান ছিল চোখে পড়ার মত তাঁরা আরও বহু দায়িত্ব পালন করতেন অনেকটা আব্বাসিয় খিলাফত ও মুঘল সাম্রাজ্যের মত। হারেম বা জেনানায় প্রধান খোজার কাজ ছিল সুলতান এবং নারীদের খিদমৎ করা। বাইজেনটাইন ও ফাতিমি দরবারেও খোজাদের ব্যাবহার ছিল এবং তাঁদের কিছু গুরুত্বপূর্ণ পদে থাকার কথা আমরা জানতে পারছি।

এবার আমরা খোজাদের শ্রেণীবিভাগ বিষয়ে জানব। খোজা ব্যবসা বিষয়ে আবুল ফজল 'আইন-ই আকবরি'তে তিন ধরনের খোজার উল্লেখ করেছেন। তিনটি শব্দ দিয়ে তাঁদের বর্ণনা করা হয়েছে, যেমন সান্ডালি, বাদামী আর কাফুরি। সান্ডালি খোজাদের সম্পূর্ণ জননাঙ্গ কাটা থাকত। তাঁদের আরেক নাম আলতাসি। বাদামীদের লিঙ্গের একটা অংশ কিছুটা কাজ করত, একটা অংশ করত না। কাফুরিদের অণ্ডকোষ হয় কাটা থাকত অথবা সেটিকে অকেজো করে সম্পূর্ণ চূর্ণ করে দেওয়া হত। সান্ডালি অর্থ চন্দনগন্ধী, বাদামী অর্থে কাজুবাদাম বর্ণের আর কাফুরি অর্থে কর্পূরগন্ধী।

ফরাসি মুসাফির ফ্রাঙ্কো পাইরার্ড বাংলায় খোজা ব্যাবসা নিয়ে বেশ কিছু কথা লিখেছেন যার কিছুটা এখানে উল্লেখ করছি, '...শুধু তাঁদের (খোজাদের) অণ্ডকোষই কাটা হত না, গোটা যৌনাঙ্গটাই দেহ থেকে উপড়ে ফেলা হত। আমি এরকম কয়েকজনকে দেখেছি, যাদের দেহ থেকে জল বের করবার জন্যে একটি মাত্র ফুটো আছে - কোনও জননাঙ্গ নেই।' সাধারণত খোজাদের নাম দামি পাথর বা রত্নের নামে দেওয়া হত। ইতিহাসে আমরা খোজাদের বেশ কয়েকটি নাম পাচ্ছি, কাফুর (কর্পূর), করণফিল (লবঙ্গ), ফিরুজি (নীলকান্তমণি), আলমাস (হিরে), ইয়াকুত (রক্ত-সাদা শিসমণি), হাবসি খান, আনদিল,

সিদ্দি বদর ইত্যাদি। নামগুলি থেকে এটাও বোঝা যায় এরা সকলেই বাংলার জন্ম-খোজা নন। কাফুর, হাবসি খান, আনদিল বা সিদ্দি বদর নাম থেকে বলা যায় এরা আফ্রিকার খোজা। অর্থাৎ, আমরা বুঝতে পারি যে খোজাদের স্তরবিন্যাস (Stratification) হত মুলত দুটো বিষয় ধরে, - তাঁদের দেহ বর্ণ এবং বিকৃত জননাঙ্গ বিচার করে।

এবার খোজা তৈরি ও ব্যাবসা বিষয়ে আলোকপাত করা যাক। খোজা তৈরি ও বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বাংলা উপনিবেশপূর্ব যুগে ছিল অন্যতম বড় ঘাঁটি। মুসাফির ফ্রান্সিসকো প্লেসারেত বলছেন খোজা বাণিজ্যের প্রধান কেন্দ্র ছিল বাংলার ঘোড়াঘাট আর সিলেট। তবে খোজা সরবরাহের জন্য বাংলাই যে একমাত্র স্থান ছিল এমনটা মনে করার কারন নেই। এর কারণ, সাধারণ পরম্পরার শল্য চিকিৎসার সামান্য জ্ঞান থাকলেই যেকোনো সময়ে যেকোনো জায়গায়, যে কোনও মানুষের খোজাকরণ সম্ভব ছিল। ফলে দার-উল ইসলামের প্রান্ত ক্ষেত্রগুলো যেমন বাংলা, মিশর, জাভা ও সুদানের নুবিয়া ইত্যাদি অঞ্চল খোজা উৎপাদন এবং ব্যাবসার অন্যতম বড় কেন্দ্র হয়ে ওঠে। জাভার ক্ষেত্রে ভারথেমা ষোড়শ শতকের প্রথমপাদে লিখছেন '...এই দ্বীপে ব্যাবসায়ীরা শিশু কেনা ছাড়া অন্য কোনও ব্যাবসায় জড়াত না, তারা বাচ্চাদের জীবন থেকে সবকিছু কেড়ে নিয়ে তাকে মহিলাদের মত গড়ে পিটে বাজারের চাহিদা মত তৈরি করত।' টম পিরেস ১৫১৩য় বলছেন, 'জাভায় বিপুল সংখ্যায় খোজা ছিল। তাঁদের মুলত মহিলাদের মত কাপড় পরানো হত। মাথার চুল চুড়ো করে মাথার মাঝখানে ঊষ্ণীষের মত করে বাঁধা হত। খোজারা জাভার ঈর্ষান্বিত জনসাধারণের থেকে বাড়ির মেয়েদের বাঁচাতে অন্তঃপুরের মহিলাদের দেহরক্ষী হিসেবে নিযুক্ত করত। তবে অভিজাত, জমিদার, ধনীরা, তাদের বাড়ির মেয়েদের প্রকাশ্য রাস্তায়, খোলামেলা পরিবেশে বের হতে দিত না। পর্দা প্রথা রক্ষার জন্যে তাঁরা প্রাণ দিতেও পিছপা হত না...।'

ত্রয়োদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে মার্কোপোলোর স্মৃতিকথা খোজা ব্যাবসা বোঝার অন্যতম প্রাচীন লেখ্য সূত্র। তবে তিনি বাংলায় এসেছিলেন ঠিকই, তবে বাংলার ভূগোল বিষয়ে তার জানা-বোঝার প্রক্রিয়া সীমিত ছিলনা, একথা জোর দিয়ে বলা যায়না। তাও, তার উদ্ধৃতি তুলে দেওয়া যাক, 'এখানে প্রচুর খোজার বাস। এই প্রদেশ থেকে প্রতিবেশী দেশের আমীরেরা খোজা সংগ্রহ করতেন... এই অঞ্চলে ভারতীয় ব্যাবসায়ীরা এসে আমার পূর্বে উল্লিখিত খোজা এবং দাস কিনে অন্য দেশে গিয়ে তাঁদের বিক্রি করে দ্যায়। এ দেশ খোজায় ভর্তি কারণ যাদেরই জেলে পোরা হত, তাঁদের প্রত্যেককেই খোজা বানানো হত।' মার্কোপোলোর বর্ণনায় খোজা হওয়া শিশুদের কোন রাস্তায় ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে পরিবহন করা হত সে তথ্য পাওয়া যায়না এবং বকেয়া রাজস্ব যে খোজা হাত বদল করে শোধ করা হত (*খোজা নজর*) তাও এঁর লেখায় পাওয়া যায় না। তার মনে হয়েছে অধিকাংশ খোজা যুদ্ধবন্দী। এর এক' দু শতাব্দের মধ্যে খোজা ব্যাবসা ফুলে ফেঁপে ওঠে এবং বাংলা থেকে প্রতিবেশী রাজ্যের বাজারগুলিতে বিপুল সংখ্যায় খোজা সরবরাহ ব্যবসা শুরু হয়। ষোড়শ

শতকের প্রথমার্ধে সুলতান আলাউদ্দিন হুসেন শাহের রাজত্বে দুই ইওরোপীয় মুসাফিরের লেখায় বংলায় খোজাদের নিয়ে তুমুল ব্যাবসার কথা জানা যায়। 'সুমা ওরিয়েন্টাল' বইতে টম পিরেজ লিখছেন, 'বাংলার খোজা রাখা [স্বচ্ছল গৃহস্থদের তুমুল] শখে পরিণত হয়েছে, বিশ্বে [খোজাদের নিয়ে] এমন [আগ্রহ] কোথাও দেখিনি।' ডুরেট বারবোসার লেখা আরও তথ্যদায়ী, 'শহরের [বাংলার] মুসলমান ব্যাবসায়ীরা অবসর সময়ে দেশের ভেতরে হিদেনদের বাবা-মার থেকে তাঁদের ছেলেদের কিনে বা চুরি করে তাদের খোজা করত যাতে তারা অন্য কোনও কাজের উপযোগী না থাকে। খোজা করার সময়ে অনেকে মারাও যেত, যারা বেঁচে থাকল, তাঁদের সুচারু প্রশিক্ষণ দিয়ে বিক্রি করা হত। খোজাদের মহিলা, বাগান বা অন্যান্য সম্পদের সুরক্ষা দেওয়ার জন্যে ব্যাবহার করার প্রথা ছিল। এধরণের কাজ করতে খোজারা পারদর্শী হয়ে উঠত। খোজারা সমাজে চরিত্রবান মানুষ হিসেবে প্রভূত সম্মান পেয়েছে।' ফ্রাঙ্কো পাইরার্ড বলছেন, এখানে কিছু জায়গায় রাজার নির্দেশে বাবা তার পুত্রকে বিক্রি করে রাজাকে উপহার দিত এবং বাংলার অন্যতম বড় ব্যাবসা ছিল দাস ব্যাবসা। ভারতের অধিকাংশ দাস তাই এই অঞ্চল [সিলেট] থেকেই আসত।

খোজা ব্যাবসা ও খোজা তৈরি করার একটি মজার বিষয় হল, খোজা বাণিজ্যের একাধিপত্য মুসলমান ব্যবসায়ীদের নিয়ন্ত্রণে থাকলেও খোজাকরণের কাজে তাঁরা অংশ নিত না। তারা খোজা করার জন্য বালক কিনত হয় বাবা-মায়ের থেকে না হয়ে ছেলেধরাদের থেকে। ব্যাবসায়ীরা খোজা বালক না পেলে সেই বালকটিকে খোজা করার ব্যাবস্থা করতে হত। বাংলার ক্ষেত্রে বালকদের খোজাকরণের জন্য প্রয়োজনীয় শল্য চিকিৎসার কাজ করতেন স্থানীয় হিন্দু বৈদ্য ও গ্রামীন চিকিৎসকেরা। বাংলার মুলত সিলেট ও ঘোড়াঘাট অঞ্চলেই খোজাকারীরা অপহৃত, কিনে আনা, বেপথে চলে যাওয়া বালকদের মুসলমান দাস ব্যাবসায়ীদের কাছে বিক্রি করে দিত। বাংলার বাইরেও শিশুদের খোজা করার কাজ স্থানীয় সংখ্যালঘুরা করতেন। যেমন মিশরে এই কাজের দায়িত্বে ছিলেন কেপ্টিক সন্ন্যাসী। বাড়ির কর্তারা কেন বাচ্চাদের খোজা করে বিক্রি করে দেওয়ার অনুমতি দিত, সে কারণ আজ আন্দাজ করা মুশকিল। সাম্ভাব্য কয়েকটি কারণ হতে পারে গরীবি থেকে মুক্তি, খোজাদের প্রশাসনের উচ্চপদে ওঠার পরের সামাজিক সম্মান-হাসিলের সম্ভাবনা, হয়ত রাজস্ব দিতে না পারার অক্ষমতা ইত্যাদি।

এখানে আওরঙ্গজেবের খোজা মুতামিদ খানের প্রসঙ্গ উল্লেখ না করে পারছি না, যা খোজাদের খোজাকরণের বিষয়ে অন্যতম সূত্র। খোজা মুতামিদ খানের নাম সাম্রাজ্য জুড়ে ছড়িয়ে পড়লে, পুত্রের খ্যাতি উদযাপন করতে পিতা মাতা বাংলা থেকে আগ্রায় এসে উপস্থিত হন। পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর এই প্রথম মুতামিদের পিতা মাতা তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন। কিন্তু মুতামিদ মানসিকভাবে আপ্লুত হওয়ার পাত্র ছিলেন না। পিতা মাতা যেহেতু তাঁর শৈশবের সব থেকে দামি অনুভুতি, পরিবারের

সদস্যদের ভালবাসা থেকে তাঁকে বিচ্যুত করেছে এবং তাঁর পুরুষত্ব কেড়ে নিয়েছে, তাই তিনি তাঁর পিতা মাতাকে প্রাসাদের দরজায় বহুদিন অপেক্ষা করিয়ে চাবুক মেরে তাড়িয়ে দেন। এই ঘটনাটা হয়ত একটু অতিরঞ্জিত আর এই ঘটনাটা বাজারের কুটকাচালি থেকেই সংগৃহীত, কিন্তু বাচ্চাদের খোজা করে দেওয়ার বিষয়ে এই ঘটনা থেকে কিছু একটা যুক্তি পাওয়া গেল।

ইতিমধ্যে আমরা জেনেছি, খোজাদের বিক্রি করা হত আমীর অভিজাতদের জেনানা আর বাগান পাহারা দেওয়ার জন্যে। কিন্তু এর বাইরেও খোজাদের, বিশেষ করে হাবসি খোজাদের রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের উদাহরণ পাওয়া যায়। সুলতানি যুগে উঁচু রাজনৈতিক পদে অবস্থানরত বেশ কয়েকজন খোজার নাম পাওয়া যায়। এঁদের মধ্যে অন্যতম নাম জৌনপুরের শর্কি সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা মালিক সারওয়ার যাকে নিয়ে আমরা পরে বিশদে আলোচনা করব।

সুলতানি যুগে খোজারা বিপুল হারে প্রশাসনের পদে নিযুক্ত হতেন। ফ্রেয়ার লিখছেন, 'খোজারা প্রভুদের মনঃতুষ্টি করে...দাস অবস্থা থেকে সাম্রাজ্য প্রধানও হয়েছে।' মুঘল যুগে খোজাদের রাজনৈতিক অধিকারের ভুমিকা প্রায় শূণ্য ছিল। তুর্কি আক্রমণের আগেই বাংলায় খোজাদের অস্তিত্বের ব্যাপারে জানা গেলেও তুর্কি বিজয়ের পরে ১৩৩৮এর সুলতান ফকরুদ্দিন মুবারাক শাহের রাজত্বে স্বাধীন সুলতানি আমলের সুচনা থেকেই বাংলায় খোজার চাহিদা বাড়তে শুরু করে আমীর অভিজাতদের বাড়ির নানা ধরণের কাজকর্ম সামলানোর জন্যে। খোজাদের নিযুক্ত করা হত অন্দরমহল বা জেনানা, বাড়িঘরদোর সামলানোর ও বাগিচার কাজকর্ম দেখাশোনা করতে।

সুলতানি যুগে বাংলায় দু ধরণের খোজা অস্তিত্ব পাচ্ছি - দেশি, বিদেশি। বিদেশি খোজাদের হাবসি (এঁদের অধিকাংশ পূর্ব আফ্রিকার আবিসেনিয়া অঞ্চলের অধিবাসী) বলা হত। সুলতান রুকনুদ্দিন বরবক শাহ প্রশাসনে প্রচুর পরিমানে হাবসি খোজা নিযুক্ত করেন। তাঁর আমলে খোজার সংখ্যা ছিল ৮০০০। তাঁর উত্তরাধিকারী শামসুদ্দিন ইউসুফ শাহ এবং জালালউদ্দিন ফতেহ শাহের রাজত্বে হাবসি দাসেরা বিপুল পরিমান শক্তি ও সম্পদের অধিকারী হয়ে ওঠে। একটা সময়ের পর খোজাদের ক্ষমতা সুলতানের কাছে বিপদ হয়ে ওঠে এবং খোজাদের ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করতে জালালউদ্দিন ফতেহ শাহ উদ্যত হন। বিদ্রোহী হাবসি খোজাদের হাতে তিনি নিহত হন এবং সুলতানের তাজ আসে হাবসি নেতা বারবক শেহজাদার মাথায়। কিন্তু কয়েক মাসের মধ্যেই তিনিও সিংহাসন হারান হাবসি সেনাপতি মালিক আন্দিলের হাতে। মালিক আন্দিল সাইফুদ্দিন ফিরোজ শাহ উপাধি নিয়ে সিংহাসনে বসেন। তিন বছর শাসন করার পর প্রাসাদরক্ষীর হাতে তিনিও নিহত হন। এরপর ক্ষমতায় আসেন দ্বিতীয় নাসিরুদ্দিন মাহমুদ শাহ যিনি কিছু সময় রাজত্ব করার পর এক হাবসি সর্দারের হাতে নিহত হন। সেই সর্দার শামসুদ্দিন মুজাফফর শাহ নাম নিয়ে সিংহাসনে বসেন (১৪৯১-১৪৯৩)। অত্যাচারী ও হত্যাকারী হিসেবে তাঁর কুখ্যাতি

ছিল, ফলে গৌড়ের সম্ভ্রান্ত আমীর অভিজাতরা তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। তাঁর মৃত্যু হয় এবং বাংলায় হাবসি যুগ শেষ হয়।

এর রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়ায়, সে সময় বহু হাবসিকে বাংলা থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়ে এবং অনেকেই গুজরাট আর দাক্ষিণাত্যে আশ্রয় নেয়। কিন্তু মজার বিষয় হল এত হুলাবিলা সত্ত্বেও বাংলায় হাবসি খোজাদের আধিপত্য শেষ হল না। টম পিরেজ ষোড়শ শতকের দ্বিতীয় দশকে বাংলার সম্ভ্রান্ত ঘরে প্রচুর হাবসিদের কাজ করতে দেখেছেন।

সুলতানি ও মুঘল যুগে খোজাদের জেনানা রক্ষার দায়িত্বে দেখা যেত। সুলতানি আমলের জেনানার বর্ণনা পাওয়া যায় ইবন বতুতার লেখায়। যেহেতু তিনি বিভিন্ন ইসলামি দেশ ঘুরে দিল্লিতে এসেছিলেন, তাই তাঁর লেখায় ইসলামি সংগঠন ও কৃষ্টির তুলনামূলক আলোচনা পাওয়া যায়। শেখ রিজকুল্লা মুস্তাকি 'ওয়াকিতইমুশতাকি'তে যে অভিজাত আমীরের জেনানার বর্ণনা দিচ্ছেন, সেখানে বলা হচ্ছে গৃহস্থর বাড়িতে নির্দিষ্ট একটি এলাকার ভিতরে খোজাদের ঢুকতে দেওয়া যেমন হত না, তেমনি খোজাদের সকলের সঙ্গে মিশতে দেওয়াও হত না। রিজকুল্লা মুস্তাকি লিখছেন, 'দরজার সামনে একজন হাজিব [দ্বাররক্ষী] পাহারায় থাকতেন; হারেমের ঠিক সামনে কোনো একজন পর্দাদার দাঁড়িয়ে থাকতেন; ভেতরের দরজায় থাকতেন একজন খাজাসারা [খোজাদের প্রধান] আর প্রাসাদের ভেতরের দেওয়াল ঘেঁসে একজন বৃদ্ধা বসে থাকতেন। হারেমে যদি কোনও বার্তা পাঠাতে হত, তাহলে হাজিব সেই বার্তাটিকে পাহারাদারের কাছে পৌঁছে দিতে হত, পাহারাদার বার্তাকে নিয়ে যেত খাজাসারার কাছে, খাজাসারা সেই বার্তা পৌঁছে দিত ভিতরের দেওয়াল ঘেঁসে বসে থাকা বৃদ্ধার কাছে। এই বার্তা উদ্দিষ্ট মহিলার কাছে যাবে কিনা, সেটা বৃদ্ধা তাঁর বুদ্ধি অনুযায়ী নির্ণয় করতেন। হারেমের দরজাতেও খোজাদের পাহারা ছিল। ক্ষমতাসীন মানুষদের সমস্যা ছিল খোজাদের পুরুষ শরীর। যদিও খোজার পক্ষে মহিলাদের সঙ্গে যৌন সংসর্গ করা সম্ভব ছিল না, তবুও তাদের পর্দার পিছনে মহিলা জেনানায় পা দেওয়া সাধারণভাবে নিষিদ্ধ ছিল। খোজাদের পুরুষালি শরীর ও মহিলাদের সঙ্গে যৌন সংসর্গে লিপ্ত হওয়ার অক্ষমতা ছিল তাঁদের দিয়ে জেনানা মহল পাহারা দেওয়ানোর মূল কারণ। মুঘল যুগে অভিজাতদের জেনানায় বিপুল ভৃত্য ও রক্ষী ব্যবস্থাপনায় দরবারের মত বিস্তৃত শ্রেণিবিভাগ ছিল না। প্রশাসনিক ব্যাবস্থাপনা বাদ দিয়ে মহিলাদের নিরাপত্তা এবং যত্ন নেওয়ার কাজটা খোজারাই করত।

তবে আকবরের আমলে খোজাদের হারেম থেকে তুলে আনা হয় এবং তাদের হারেমের কাজ কমিয়ে দেওয়া হয়। আবুল ফজলের 'আইনইআকবরি' সূত্রে দেখতে পাচ্ছি জেনানা মহল থেকে খোজাদের সরিয়ে সেখানে শান্ত ও সংযত মহিলা রক্ষী মোতায়েন করা হচ্ছে। খোজাদের মোতায়েন করা হত প্রাসাদের বাইরে। এবং জেনানার অন্তঃপুর থেকে তাঁদের নির্দিষ্ট দুরত্ব পালন করার নির্দেশ দেওয়া হয়।

ধীরে ধীরে আমরা দেখতে পাচ্ছি লিঙ্গ-থাকবন্দী আরও পরিষ্কার হচ্ছে। ফতেহপুর

সিক্রির মূল প্রাসাদে পর্দা প্রথা পালন করার জন্য আকবর নতুন আঙ্গিকের স্থাপত্যের বিকাশ ঘটান। মনসারেত সুত্রে খানা-ঘরের যে বর্ণনা পাওয়া যায়, সেখান থেকে বোঝা যায় আকবর পুরুষ মহিলার অবাধ মেলামেশা রোধ করতে তৎপর ছিলেন। মনসারেত বলছেন, 'সেগুলি [খাওয়া বহনকারী তৈজস] যুবারা খাওয়ার ঘরের দরজার সামনে বয়ে আনে। যুবাদের সামনে ভৃত্যরা সার বেঁধে যায় এবং প্রাসাদপ্রধানও সেখানে উপস্থিত থাকেন। এখানে খাদ্যপাত্রগুলো হাতবদল হয় খোজাদের সঙ্গে। তাঁরা খাওয়ার জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকা যুবতীদের হাতে সেগুলি তুলে দ্যায়।' এটা ছিল জেনানা মহল আর পুরুষ মহলের মাঝের অংশ যেখানে মুলত খোজাদের (এবং মহিলা ভৃত্য আর অভিকর শিল্পীদের জন্যে বরাদ্দ, যাদের কাজের চরিত্র তুলনামূলকভাবে দুই এলাকায় যাওয়া আসার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট) কাজকারবার। ফলে আমরা বুঝতে পারছি খোজাদের জেনানা মহল থেকে বের করে, জেনানার বাইরে প্রাসাদের বিভিন্ন কাজকর্মে লাগানো হচ্ছে।

জেনানা মহলের কাঠামো দেখলেই বোঝা যায়, খোজাদের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেই এই কাঠামো বানানো হয়েছিল। বিশ্বস্ত ভৃত্য হিসেবে তাঁদের ওপর গুরুত্বপূর্ণ ও গোপন খবর আদান-প্রদান করার দায়িত্ব ছিল। আওরঙ্গজেবের বোন রওশনারা বেগম তাঁর বিশ্বস্ত খোজা দাসের মাধ্যমে তাঁর অসুস্থ ভাই-এর খবরাখবর নিতেন। এমনকি শাহ জাহানকে গৃহবন্দী করার পর আওরঙ্গজেব উচ্চপদস্থ খোজা, ইতিবর খান বা মুতামিদ খানের ওপর দায়িত্ব অর্পন করেন পিতাকে নজরে রাখার জন্যে। বাবরের ভৃত্য খোজা ইতিবর খানের দায়িত্ব ছিল ইরান থেকে ভারতে আসা মহিলাদের সুরক্ষা দেওয়া। 'আইন-ই আকবরি'তে আরও কিছু খোজাদের উচ্ছ-মাঝারি আমলা পদে কাজ করার কথা জানা যায়। ইতিমদ খানকে আকবরের শাসন আমলের প্রথম দিকে অর্থদপ্তর সামলাতে দেখা যায়। অর্থাৎ, যুদ্ধবন্দী বা বিক্রি হয়ে আসা খোজা দাসেদের বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ পদে নিযুক্ত হওয়ার উদাহরণ পাওয়া গেল।

এবার আমরা খোজা বিষয়ক আলোচনা কয়েকজন বিশিষ্ট খোজার (যাদের তথ্য পাওয়া যায়) জীবন ও কাজ ধরে করব এবং সেই সঙ্গে তাঁদের সম্মান ও দরবারি মর্যাদা বোঝার চেষ্টা করব।

মালিক সারওয়ার

মুঘল পূর্বতন সময়ে খোজাদের অভূতপূর্ব সাফল্যের একটি বড় উদাহরণ হল মালিক সারওয়ার। ১৩৮৯ সালে তিনি খাজা-ই-জাহান উপাধি পান। মালিক সারওয়ার খ্যাতি জৌনপুরে শর্কি শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য (প্রসঙ্গত উল্লেখ্য মালিকুলশার্ক হল সুলতানি আমলে বাংলার শাসনকর্তাদের অভিধা। ফলে জৌনপুরের শর্কি শাসনের অর্থ পূর্ব অঞ্চলের শাসক)।

মালিক সারওয়ার তুঘলক শাসনকালে ১৩৯৪ সালে নাসিরুদ্দিন মোহাম্মদ শাহ তুঘলক দ্বারা মালিকউলশার্ক উপাধি সহ জৌনপুরের প্রধান প্রশাসক হিসেবে নিযুক্ত

হন। গঙ্গাতীরে অবস্থানরত জৌনপুর শহর কৌশলগত দিক থেকে ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ ছিল। আমীর তৈমুরের (বা সুজাউদ্দিন বেগ তৈমুর) আক্রমণের সুযোগ নিয়ে মালিক সারওয়ার আতাবাক-ই-আজম উপাধি নিয়ে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন ও শর্কি সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। এটাওয়া, কোলি, কনৌজের বিদ্রোহ দমন করে দক্ষিণ বিহার পর্যন্ত রাজ্য বিস্তার করে একজন দক্ষ প্রশাসক হিসেবে পরিচিত হন। বাংলার লক্ষনৌতি এবং ওড়িশার জাজপুরের শাসকেরা তাঁর বশ্যতা স্বীকার করেন এবং উপহারস্বরূপ তাঁর দরবারে হাতি পাঠান। তাঁর শাসনকালে শিল্প-সংস্কৃতির বেশ উন্নতি ঘটেছিল। তাঁর আমলে আটালা মসজিদ ও জামা মসজিদ তৈরি হয়।

মালিক সারওয়ার, মালিক উজির নামের একটি হিন্দু বাড়ির দাস পুত্রকে দত্তক নিয়ে ছিলেন। মালিক উজির তুঘলক সুলতানের জলবাহক ছিলেন। মালিক সারওয়ারের মৃত্যুর পর তাঁর দত্তপুত্র মালিক করনফিল নাম নিয়ে সিংহাসনে বসে মুবারক শাহ নাম নিলেন। তিন বছরের রাজত্বে মুবারক শাহ নিজের নামের মুদ্রা চালু করেন।

অম্বর

সম্রাট বাবরের ভাইপো আবু বকরের দরবারে এক খোজার (গুলাম-এ আখতা) সম্বন্ধে জানা যায়। হুমায়ুনের বদনাধারক জৌহরআফতাবাচি তাঁর প্রভুর স্মৃতিকথা 'তাজকিরাতুলওয়াকিয়ত' এবং 'হুমায়ুননামা' অনুযায়ী সেই খোজার নাম ছিল অম্বর। গুলবদন, তাঁর দাদার স্মৃতিকথায় প্রায় শেষের দিকে একমাত্র খোজা এই অম্বরের কথাই উল্লেখ করেছেন। দুঃখের বিষয়, অনুবাদক এনেট বেভারেজ যেহেতু অম্বরের নাম নাজির অনুসর্গে, অম্বর নাজির হিসেবে উল্লেখ করছেন, তাই তিনি অম্বরের লিঙ্গ-পরিচয় ধরতে পারেননি। এবং তিনি নাজির অর্থে, সাধারণ সুপারিন্টেন্ডেন্ট হিসেবে অনুবাদ করেছেন।

হুমায়ুনের যুদ্ধযাত্রার ছবিগুলো দেখলে আর বর্ণনা পড়লে বোঝা যায় অম্বর শুধুমাত্র এক সাধারণ নাজির বা সুপারিন্টেন্ডেন্ট ছিলেন না তিনি সম্রাটের ভকিল বা প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করেছেন এবং সম্রাটের যুদ্ধযাত্রার কাজকর্ম তিনিই সামলেছেন। তিনি সম্রাট এবং সাম্রাজ্ঞীর জেনানার ভেতরে থাকেন এবং রাজ্ঞীর বাহিনীর সঙ্গেও জুড়ে থাকেন। শের শাহের কাছে পরাজিত হয়ে হুমায়ুন যখন পালিয়ে যান, অম্বর তখন সম্রাট ও সাম্রাজ্ঞীর ব্যক্তিগত সহচরের ভুমিকাও পালন করেছেন। কাবুল থেকে হুমায়ুনের স্ত্রী মারিয়াম মাকানি, হামিদা বানু যে কাফেলা সহকারে দিল্লি পৌঁছান, সেই দলে অম্বর ছিলেন বলে শাদাব বানো দাবি করছেন।

ইতিমদ খান

খোজা সমাজ আলোচনায় ইতিমদ খান অন্যতম আশ্চর্যের এবং উজ্জ্বল নাম। আকবরের শাসনকালের প্রথম দিকে তাঁকে রাষ্ট্র পরিচালনার খুব গুরুত্বপূর্ণ কিছু কাজে দেখা যায়।

অর্থদপ্তর তাঁর প্রধান কাজ ছিল। এর আগে তিনি সেলিম খানের দরবারে প্রখ্যাত আমীর ছিলেন। ১৫৭৬এ ইতিমদ খান বাংলা জয়ে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা রাখেন। পরে তিনি আফগানিস্তানে সিন্ধু অঞ্চল, ভক্ষরের সুবাদার হিসেবে নিযুক্ত হন। তাঁর অসামান্য উত্থান, রাজকীয় দায়িত্বে ভূষিত হওয়া সসম্মানে সে দায়িত্ব পালন করা, অন্যদের থেকে তাঁকে অনন্য ব্যক্তিত্বে পরিণত করেছে। আবুল ফজল লিখছেন, সে সময়ে আমলাদের রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি তছরুপ করে নিজেদের পারিবারিক সম্পত্তিতে পরিণত করার প্রবণতা রুখতে এবং শাহেনশাহের রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব দিয়ে ইতিমদ খানকে প্রশাসনে নিয়োগ করা হয়।

সম্রাট আকবরের দরবারে সাম্রাজ্য পরিচালনার কাজ অসামান্য দক্ষতার সাথে পেশ করে প্রভূত সম্মানের অধিকারী হন এবং একমাত্র তিনিই সম্রাটের মতের বিপরীতে গিয়ে পাল্টা যুক্তি দিয়ে কথা বলার যোগ্যতা কায়েম করেছিলেন। এভাবে তিনি দরবারে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন এবং তাঁর কর্মের সুবাদে মুঘল সাম্রাজ্য প্রশাসনের বিভিন্ন থাকবন্দীতে খোজাদের গুরুত্ব আর নির্ভরতা বাড়তে থাকে।

বাদাউনি বলছেন, হারেমের [জেনানার] অধিবাসীরা যেহেতু খোজা ইতিমদ খানের আনুগত্যকে স্বীকার করেছিলেন, তাই হারেমে তাঁর গতি অবাধ ছিল। ফলে তিনি সম্রাটের অসীম বিশ্বাসভাজন হয়ে ওঠেন। ১৫৬৫তে তিনি খণ্ডেশের সুলতান মীরন মুবারকের কন্যাকে মুঘল হারেমে বয়ে আনার দায়িত্ব পান।

ইতিবর খান/মুমতাজ খান

জাহাঙ্গীরের স্মৃতিকথায় বার বার ইতিবর খানের নাম উঠে এসেছে। তিনি প্রশাসনিক সেবায় যোগদান করেন মালওয়ার শেষ সুলতান, বাহাদুর খানের দরবারে। আকবর মালওয়া জয় করার সাথে, ইতিবরও মুঘল দরবারে সামিল হন। প্রথমে তিনি ১৬০৭ সালে গোয়ালিয়রের সুবাদার হিসেবে নিযুক্ত হন এবং পরে ১৬২৩ সালে আগ্রা সুবার প্রধান, সুবাদারি করার দায়িত্ব পান। ১৬২২-২৩ এর খুররমের বিদ্রোহের সময় তিনি আগ্রার পতন রোধ করেন। আগ্রা শহরকে বিদ্রোহের হাত থেকে রক্ষা করায় জাহাঙ্গীর তাঁকে মুমতাজ খান উপাধিতে ভূষিত করেন এবং ৬০০০ জাত ও ৫০০০ সওয়ারের মনসব অর্পণ করেন।

১৬২৩ সালে তাঁর মৃত্যু হয়। জাহাঙ্গীর স্মৃতিকথায় লিখছেন, '…After they [Bahadur Khan] were killed, he joined my exalted father's service. When I was born His Majesty gave him to me to be the supervisor of my establishment. He served me continuously for fifty-six years loyally, compassionately and pleasingly. Not once was I ever vexed by him, and the obligations owed him for his services are more than can be written. May god have mercy upon him.'

বখতিয়ার খান

খোজা সমাজ নিয়ে আলোচনায় সম্রাট আওরঙ্গজেবের দাস খোজা বখতিয়ার খান একটি উজ্জ্বল নাম এবং তাঁর কাজকর্মের ব্যপ্তি, দায়িত্ব পালনের যোগ্যতা বখতিয়ার খানকে বাকি সমস্ত খোজা থেকে অনন্য করে তুলেছে। গৃহস্থ এবং প্রশাসনিক কাজকর্মের দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি তিনি আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছেন, সেটা ঐতিহাসিকের দায়িত্ব, ইতিহাস লিপিবদ্ধ করার দায়িত্ব। বিশ্ব-ইতিহাসে কোনও খোজাকে ঐতিহাসিক হিসেবে দেখার ঘটনা বিরল।

দরবারে তাঁর পদমর্যাদা খুব বেশি না হলেও শিল্প ও সাহিত্যের প্রতি গভীর অনুরাগের জন্যে বখতিয়ার খান বৃহত্তর জগতে প্রভূত সম্মানে সম্মানিত হয়েছেন। সাধারণ লিপিকার হিসেবে তিনি প্রশাসনিক জীবন শুরু করেন এবং আওরঙ্গজেবের উত্তরাধিকার যুদ্ধের সময় তাঁর ব্যাক্তিগত সহকারী হিসেবে বখতিয়ার খানের পদোন্নতি ঘটে। আওরঙ্গজেবের দ্বিতীয় তাজপোরশির সময়ে বখতিয়ার 'খান' উপাধি লাভ করেন। ১৬৭৪ সালে আওরঙ্গজেব তাকে একহাজারি মনসবদারিপদে উন্নীত করে সম্মান দেখান।

তাঁর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল 'মিরাট-উল আলম' সংকলনের দায়িত্ব পালন। বার্নার্ড ডর্ন এই কাজ কে বলছেন, 'most valuable Universal History'। সিকান্দর 'হিস্টরি অফ হিন্দোস্তান'এ বখতিয়ার খানের ঐতিহাসিক জ্ঞানের মুক্ত হস্তে প্রশংসা করেছেন। 'মিরাট-উল আলম' ছাড়াও তিনি 'আইন-ই বখত', 'বায়াজ', 'রিয়াজ-উল আউলিয়া' লিখেছেন। মিরাটে... তিনি বলছেন, তিনি তাঁবেদার লেখক নন, তিনি লেখেন বৌদ্ধিক সাধনা ও বৈজ্ঞানিক নজরে ইতিহাসের খোঁজের প্রতি তাঁর দায়বদ্ধতা থেকে।

একই সঙ্গে তিনি সম্রাটের গৃহস্থিরও কিছু দায়িত্বও সামলেছেন। আওরঙ্গজেবের বড় ছেলে মোহাম্মদ সুলতানের সাথে মুরাদ বখশের কন্যা দোস্তদার বানু বেগম ও দারা শিকোর ছেলে সিফির শিকোর সাথে আওরঙ্গজেবের কন্যা জুবদাতুন্নিসা বেগমের বিয়ে তাঁর তত্ত্বাবধানে হয়।

১৬৮৫ সালে তাঁর ইন্তেকাল হয়। আওরঙ্গজেব নিজে ইমামের দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং জানাজা পড়ান। আওরঙ্গজেব তাঁর জীবদ্দশায় মাত্র দুজন খোজার জানাজায় অংশগ্রহণ করেছিলেন। তবে দাসের শেষকৃত্যে মালিকের এরূপ জড়িয়ে থাকা তাঁদের গভীর বন্ধুত্বের বার্তা দিচ্ছে।

ইতিবর খান/মুতামিদ/খোজা ফুল

মুঘল খোজা সাম্রাজ্যে বাঙালি খোজার অভাব না থাকলেও ইতিহাস-বিখ্যাত হয়েছেন বাঙালি খোজা ইতিবর খান। ইতিবরের জন্ম বাংলায়। আওরঙ্গজেবের সিংহাসন আরোহণের সময় দরবারে তিনি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ খোজা হিসেবে গণ্য হয়েছেন। শাহ

জাহানের কারাবাসের সময় কারাগার পাহারা দেওয়ার মত গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে আওরঙ্গজেব ইতিবরকে নিয়োগ করেন।

কালিকারঞ্জন কানুনগোর 'শাহজাদা দারাশুকো' উপন্যাসে বাঙালি খোজা 'এতেবার খাঁ'র পরিচয় পেয়েছি। গাভিন হাম্বলি 'আ নোট অন দ্য ট্রেড ইন ইউনকস ইন মুঘল বেঙ্গল' প্রবন্ধে সেই নামটি উল্লেখ করছেন। হাম্বলি বলছেন সুলতানি আমল থেকেই বাংলা [হয় সিলেট না হয় ঘোড়াঘাটের] ছিল খোজা সরবরাহকারীদের ঘাঁটি। খোজা ব্যবসায়ীরা খোজা করার জন্যে বালকদের কিনত হয় পিতামাতা থেকে। না পেলে তারা ছেলেধরাদের থেকে বালক জোগাড় করত। সে সময় খোজারা যেহেতু বিপুল সামাজিক সম্মান এবং অর্থ উপার্জন করত, ফলে পরিবারের এক সদস্যকে খোজা করার অর্থ ছিল সম্ভাব্য লটারির প্রথম পুরস্কার জেতার সুযোগ নেওয়া।

এরকম একটা উদাহরণ মুসাফির মানুচি সূত্রে পাচ্ছি কালিকারঞ্জনের ভাষায় 'এক খাসিকৃত [খোজা] বাঙালি মুসলমান এতেবার খাঁ' বা ইতিবর খান। বাঙালি খোজা। আওরঙ্গজেবের খুবই প্রিয়পাত্র। ষষ্ঠ মুঘল সম্রাটের সময় উচ্চপদের আমলাদের অন্যতম। বিশাল প্রাসাদে একা থাকতেন। আওরঙ্গজেব খোজা মুতামিদ বা ইতিবর খানকে শাহজাহানের কারাবাসের সময় কারাগার পাহারা দেওয়ার গুরুত্বপূর্ণ কাজের দায়িত্ব দিয়েছিলেন। তিনি সে সময় ছিলেন আগরা কেল্লার শাহী কারাগারের সুপারিন্টেনডেন্ট।

আগেই বলেছি ইতিবর খানের জন্ম বাংলায়। বাল্য বয়সের খোজা হয়ে মুঘল শাহী প্রশাসনে ঢুকে ক্রমশ উচ্চপদে আরোহন করেন। আওরঙ্গজেব সিংহাসনে আরোহণের উত্তর সময়ে তিনি দরবারে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অভিজাত হিসেবে গণ্য হতেন। খোজা পুত্রের নাম সাম্রাজ্যজুড়ে ছড়িয়ে পড়লে, বাঙালি পিতামাতার কানেও পুত্রের খ্যাতি কানে গেল। পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়ার পর এই প্রথম খোজা ইতিবর বা মুতামিদের বাবা-মা বাংলা থেকে আগরায় এলেন পুত্রের সঙ্গে দেখা করতে। পিতামাতা যেহেতু তাকে শৈশবের সব থেকে দামি অনুভূতি, পরিবারের সদস্যদের ভালবাসা থেকে বিচ্যুত করেছেন, তাই তিনি পরিবারের সদস্যদের প্রাসাদের দরজায় বহু দিন অপেক্ষা করিয়ে চাবুক মেরে তাড়িয়ে দেন - 'খোজা হওয়ার পর যে মানুষেরা বাচ্চাটার দায়িত্ব নেয় না, আমি স্বচ্ছল হতে তারাই আমার অনুগ্রহ পেতে ছুটে এসেছে'। হয়ত অতিরঞ্জিত, কিন্তু বাচ্চাদের খোজা করার তাগিদের একটা যুক্তি পাওয়া গেল।

বাবরের খোজা ইতিবর কে নিয়ে আমরা আগেই আলোচনা করেছি। খোজা আগাহ বলে একজনের নাম পাওয়া যায় যিনি আগ্রা শহরের ফৌজদারের দায়িত্ব পালন করেছেন। জাহাঙ্গিরের আমলে একজন খোজাকে গুজরাটের রাজনৈতিক ও সামরিক অবস্থা মোআয়না করতে পাঠানো হয়েছিল। তাঁর নাম ছিল ওয়াফাদার যার অর্থ বিশ্বাসযোগ্য। আইনিআকবরির তালিকায় বেশ কিছু উচ্চপদস্থ আমলার নাম পাওয়া যায় যাদের

অনেকেই খোজা ছিলেন। খাজা খাস মালিকের দরবারি উপাধি ছিল ইখলাস খান। তিনি এক হাজারি মনসবদার ছিলেন। খাজা দৌলত দরবারে উপাধি পান খাজা-ই জাহান। পরে তিনি সাম্রাজ্যের খোজাদের প্রধান হলে তাঁর উপাধি হয় নাজিরউদদৌলা। মৃত্যুর পর তাঁর সম্পত্তির পরিমাণ দেখলে বোঝাই যায় তিনি তাঁর নামের প্রতি যথেষ্ট জাস্টিস করেছিলেন।

সুলতানি থেকে ব্রিটিশ পূর্ব যুগ পর্যন্ত ঘরে হাবসি খোজা রাখা সামাজিক স্তর নির্দেশক ছিল। নবাবি আমলে, এমনকি ব্রিটিশ আমলের কিছুটা শুরুতে কলকাতায় জমিদার অবস্থাপন্ন স্বচ্ছল বাড়িতে প্রচুর হাবসি খোজা দেখা যেত। ঘরে হাবসি পোষা সে সময়ে আভিজাত্যের প্রকাশ ছিল। অর্থাৎ, খোজারা ছিল সেযুগের আভিজাত্যের অন্যতম মাপকাঠি। এই খোজারা ব্যাক্তি-মানুষ হিসেবে কতটা সামাজিক সম্মান পেত তা নিয়ে ঐতিহাসিক মহলে বেশ দ্বন্দ্ব রয়েছে। সেযুগের খোজাদের সামাজিক সম্মান নিয়ে বর্তমানের Transgender আর Non-Binary মানুষের সাথে তুলনা করা ভুল ইতিহাসচর্চা হবে। আগেই বলেছি, দুই'এর মিল আছে, এর মানে এই নয় যে দুই'ই এক। একথা জোর গলায় বলা যায়, ব্রিটিশ আমলের তুলনায় উপনিবেশপূর্ব সময়ে রাষ্ট্র বা সমাজে খোজা বা হিজড়েরা অনেক বেশি সম্মান ও গুরুত্ব পেয়েছে। মুসাফির মানুচি সুত্রে পাচ্ছি, 'সে সময় খোজারা বিপুল সামাজিক সম্মান এবং অর্থ উপার্জন করত, ফলে পরিবারের এক সদস্যকে খোজা করার অর্থ হল সম্ভাব্য লটারির প্রথম পুরষ্কার জেতার সুযোগ নেওয়া।' খোজাদের মূল্য বেশ চড়া ছিল। মুঘল সাম্রাজ্যে খোজারা ছিল মহার্ঘ্য সম্পদ। হুমায়ুনের ভাই আসকারি, শের শাহের বিরুদ্ধে হুমায়ুনকে সামরিক সাহায্য পাঠানোর বিনিময়ে দামি হাতি ও রত্ন ছাড়াও খোজার দাবি জানিয়েছিলেন।

শাহী খোজা আমলা জনৈক দৌলত খান, মৃত্যুর পর পাঁচটা মটকায় ১০ কোটি স্বর্ণ আসরাফি, অগুনতি গহনা, সোনা রূপোর আসবাব ও তৈজস, চিনামাটির পাত্র, তামা-কাঁসার তৈজস ইত্যাদি মোট তিন কোটি টাকার সম্পত্তি ছেড়ে যান। এর থেকে বোঝা যায় খোজাদের জীবনযাত্রা খুবই বর্ণময়, উজ্জ্বল এবং খরুচে ছিল। তাঁরা জীবিতকালে বহু স্থাপত্য, বাড়ী, প্রাসাদ তৈরি করেন। অনেকেই বলছেন তাঁরা জীবনকালে যে বিপুল সম্পত্তির মালিক হয়েছেন, সেটা জনগণ এবং ক্ষমতাকেন্দ্রে বসে থাকা মানুষদের দেখাতেন নানাভাবে রাষ্ট্রসমর্থিত উপায়ে খরচ করে। বিভিন্ন রাজকীয় ও সামাজিক অনুষ্ঠানে খোজারা দামি ঘোড়ায় চেপে আসতেন। তাদের দামি পরিধেয় এবং রত্নবহুল গহনা ও পোশাকের শখও ছিল চরমাকার। তাঁদের তৈরি স্থাপত্য জনগণের কাছে তাঁদের আর্থ-সামাজিক ক্ষমতার সাক্ষী হয়ে আজও দাঁড়িয়ে আছে। সম্রাট সংসর্গের সুবাদে বহু খোজা দরবারে উচ্চপদ অর্জন করেছেন এবং প্রচুর সম্পত্তি অর্জন করেছেন। সমালোচকদের বক্তব্য খোজাদের অপরিমিত সম্পত্তি ভোগ করতে দেওয়ার কারনই ছিল, খোজাদের মৃত্যুর পর যেহেতু তাঁদের উত্তরাধিকার ছিল না, স্বাভাবিকভাবেই তাঁদের সমস্ত সম্পত্তি

রাষ্ট্রের হাতে চলে আসত। আকবরের পুত্র জাহাঙ্গীর, শাহী খোজা আমলা দৌলত খান বিষয়ে বলছেন তাঁর প্রয়াণের পর, 'এই বিশালাকার সম্পত্তির প্রতি পাই পয়সা আমার পিতার খাজাঞ্চিখানার অধিকারে আসে।'

সে সময়ের কিছু বিশিষ্ট খোজার সাথে বাদশাহদের গভীর বন্ধুত্ব দেখি। এমনকি বহু খোজা আমলার বাড়িতে বাদশাহদের দাওয়াতে যাওয়ার উদাহরণ পাই - মাথায় রাখতে হবে বিশ্বে সর্বশক্তিমানের প্রতিরূপ সম্রাটেরা খুব খোলামেলাভাবে নশ্বর প্রজাদের সঙ্গে সময় কাটাতেন না। সে সময়ে খাজা হিলালের (খোজা আমলা) সাথে সৈয়দ খান চাঘতার (দাস আমলা) বিবাদের ঘটনার কথা বহুল আলোচিত। জাহাঙ্গীরের দরবারে ঘটা এই ঝামেলা থেকে খোজাদের রাষ্ট্রগত এবং তাদের সামাজিক অবস্থা, আর দাস আমলাদের সাথে সম্পর্ক বোঝার চেষ্টা করব। সম্রাটের সাথে বন্ধুত্বলাভ করার পরে খাজা হিলাল এতই ক্ষমতাশালী হয়ে ওঠেন যে তিনি নিজে একটা প্রত্যন্ত গ্রাম রুনকাটা বা রুংটাকে শহরে রূপান্তর করে, নিজের নামে সেই শহরতলীর নতুন নামকরণ করেন হিলালাবাদ। খাজা হিলাল আগ্রায় বিপুল, বিশাল, সুউচ্চ প্রাসাদ বানিয়ে তাঁর বৈভবী প্রাসাদ দেখাতে শহরের গণ্যমান্যদের বিশাল ভোজসভায় আমন্ত্রণ জানালেন। দাস আমলা সৈয়দ খান চাঘতা প্রাসাদের তুমুল প্রশংসা করলেন। তাঁর প্রশংসার উত্তরে হিলাল নরম স্বরে তাঁকে সম্মান দেখাবার জন্যে উত্তর দিলেন, 'আপনি আমার বাড়িটিকে আপনার প্রতি পেশকাশ হিসেবে কবুল করুন।' বাক্য শেষ হওয়া মাত্রই সৈয়দ খান উঠে দাঁড়িয়ে তিনটি কুর্নিশ করে কবুল কবুল কবুল উচ্চারণ করে তাঁর বিশাল ভৃত্যদের ফৌজ আর সৈন্য লেলিয়ে প্রাসাদ দখল নিলেন। উপস্থিত সকল আমলা তাঁর আচরণে অবাক হয়ে যান। স্বাভাবিকভাবেই হিলাল এই অবাঞ্ছিত হস্তক্ষেপের তীব্র প্রতিবাদ করলেন। দুই আমলার বিবাদ থামাতে জাহাঙ্গীরকে হস্তক্ষেপ করতে হয়। বাদশাহর হস্তক্ষেপ থেকেই বোঝা যাচ্ছে সেই যুগে খোজা এবং দাস আমলাদের যথেষ্ট গুরুত্ব ছিল।

ইউরোপীয়দের বয়ানে আমীরদের প্রশাসনে এবং গৃহস্থিতে খোজাদের স্বচ্ছলতা এবং ক্ষমতা বিশদে বর্ণিত হয়েছে- 'তাদের ইচ্ছেই শেষ কথা ছিল- তারা সব থেকে ভালো ঘোড়া চড়ত, বাইরে প্রত্যেক পদক্ষেপে দাসেরা দেখাশোনা করত, ঘরে মহিলারা আর তাঁরা যে কাপড় পরত, সেই গুণমান শুধু মালিক পরতে পারতেন।' এধরনের বয়ানে তাঁদের স্বচ্ছলতার মূল কারন হিসেবে বলা হয়েছে তাঁদের নারীস্বভাব, যে যুক্তি খুবই পলকা এবং ভিত্তিহীন।

খোজাদের সামাজিক সম্মান বিষয়ে আমীর শাহ কুলির কথা বলতেই হয়। হারেমে ঢোকার অনুমতি পাওার পর আমীর শাহ কুলি [কুলি শব্দের অর্থ ভৃত্য] নিজেকে খোজা করে ফেলেন। পূর্ণবয়স্ক ব্যাক্তি স্ব-ইচ্ছায় নিজেকে খোজা করছেন, এমন আশ্চর্যজনক ঘটনার বিরল নজির হল আমীর শাহ কুলি। এখান থেকে একটি বিষয় বোঝা যাচ্ছে সে যুগে খোজা করাকে অসামান্য সম্মানে সম্মানিত করা হত। মুঘল আমলেও যৌনতা

নিবারন, শারীরিক নানান আনন্দ সংবরণ করাকে উচ্চমান্যতা দেওয়া হত, সম্মানিত করা হত এবং এই ধরণের মানুষও সম্রাটের সঙ্গে আলাদা ঘনিষ্ঠতা অর্জন করতেন। জনগণের কাছে সম্রাটের অদেখা এক ধরণের অনুদ্ঘাটিত চিত্র একমাত্র এই ধরণের মানুষের কাছেই উন্মুক্ত থাকত।

গবেষক শাদাব বানো বলছেন সামাজিকভাবে দাস বা শারীরিক-সামাজিকভাবে খোজা হওয়া এই মানুষদের সামাজিক বা রাষ্ট্রীয় মর্যাদা পাওয়ার পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায় নি, বরং বৃহত্তর সামাজিক সম্মান পাওয়ার রাস্তা খুলে দিয়েছিল। খোজা ইতিমদ খান যাকে নিয়ে আমরা আগেই আলোচনা করেছি, তাঁর নিয়োগ সম্পর্কে আবুল ফজল মুক্ত কণ্ঠে প্রশংসা করেছেন। তিনি বলেছেন এই নিয়োগ আসলে সম্রাটের সাম্রাজ্য বিষয়ে স্বচ্ছ দৃষ্টির প্রমাণ এবং সাম্রাজ্যের বুনিয়াদ পাকা করার পথে এক বড় ধাপ।

দরবারি ইতিহাস কিছু বাছা বাছা খোজার জীবন ও কাজকর্ম নিয়ে আলোচনা করেছে এবং তাঁদের প্রায় সব্বাই আমলাতন্ত্রের মাঝারি বা মাঝারি-ওপরের থাকবন্দীত্বে সাম্রাজ্যকে সেবা দিয়েছেন। তৃণমূল স্তরে কাজ করা খোজাদের জীবন, কাজকর্ম বা সামাজিক সম্মান বিষয়ে কোনও তথ্যই নেই বললেই চলে। তবে একথা ঠিক, খোজা হওয়াটা আর্থিক উন্নতির ক্ষেত্রে বাধা ছিল না। দরবারের বিশিষ্ট খোজা, যাদের বাদশাহের সাথে ওঠা বসা, তাঁদের সামাজিক সম্মান ছিল এবং যথেষ্টই ছিল- একথা জোর গলায় বলা যায়।

খোজাকরণ বন্ধের চেষ্টা কেউ করেনি তা নয়। আকবর পুত্র জাহাঙ্গীর খোজাকরণ রুখতে তৎপর হয়েছিলেন। প্রথমে তিনি 'খোজা নজর' [বকেয়া রাজস্বের দায় খোজাদের দান করে মেটানোর প্রথা] দেওয়ার প্রথাকে ঘেন্না প্রকাশ করে বাংলার সুবাদার কোকাভাই ইসলাম খান কে ১৬০৮-এ লিখলেন সিলেট থেকে রাজস্ব না দিয়ে কেন্দ্রীয় খাজাঞ্চিতে খোজা বা হিজড়া পাঠানোর প্রথাটি সুবার বিভিন্ন সরকারের কাছারিগুলোয় ছড়িয়ে যাচ্ছে, এই কাজ মুঘল আমলাদের স্বাভাবিক কাজ বলে মনে হচ্ছে, একে অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে। জাহাঙ্গীর নির্দেশ দিলেন খোজাকরণ করা মৃত্যুদণ্ডসম অপরাধ। সুতরাং খোজাদারদের কবল থেকে বালক খোজাদের মুক্ত করতে হবে সুবাদারকে নিজ উদ্যোগেই। এর আগে আকবর কিছুটা চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছিলেন। কিন্তু জেদি সম্রাট জাহাঙ্গীরের কঠোর নির্দেশে বাংলার খোজাকরণ কিছুটা ধাক্কা খায়। ঐতিহাসিকেরা বলছেন পূর্ণ বয়স্ক খোজা বা হিজড়েদের সম্বন্ধে জাহাঙ্গীর নির্দেশ দেন নি। 'তুজুকি জাহাঙ্গিরি'তে বহুবারই খোজাদের বিষয়ে লিখেছেন সম্রাট। ১৬১০ এ বিহারে প্রথাটি নিষিদ্ধ করার সত্ত্বেও, আইনভঙ্গ করে জোর করে খোজাকরণের অভিযোগে বেশ কিছুজন ব্যাবসায়ীকে কেন্দ্রীয় দরবারে পাঠালেন সেখানকার সুবাদার আফজাল খান। তাঁদের সকলেরই যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হয়। ১৬১৩য় ইসলাম খান বাংলা থেকে ৫০ জন হিজড়াকে আগ্রার দরবারে পাঠান যাদের অনেককেই বিভিন্ন আমীর বাড়ি থেকে

পাদশাহের নির্দেশে উদ্ধার করা হয়েছে।

তবে জাহাঙ্গীরের খোজা নিষিদ্ধকরণের উদ্যম চেষ্টার সত্ত্বেও শাহী বা অভিজাতদের গৃহস্থালী বা শাহী প্রশাসনেদের চাহিদা কমেনি। আকবর এবং জাহাঙ্গীরের দরবারের উচ্চপদস্থ দাস আমলা, সৈয়দ খান চাঘতা (যাকে নিয়ে আমরা আগেই আলোচনা করেছি) ১২০০০ খোজা নিয়ে এক বিশৃঙ্খল পরিবার চালাতেন বলে জানা যায়। মুঘল আমলের শীর্ষ সময়ে, সমগ্র সপ্তদশ শতক জুড়ে খোজা ব্যবসার বিন্দুমাত্র পতন ঘটেনি।

খোজারা বিপুল সম্পত্তির মালিক এবং ক্ষমতার অধিকারী ছিল বলে এটা ভেবে নেওয়ার কোনও কারন নেই যে তাঁদের শত্রুর অভাব ছিল, বলছেন আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের রিসার্চ স্কলার লুবনা ইরফান। দিন শেষে খোজারা পিতৃতান্ত্রিক ব্যাবস্থায় 'পুরুষ নয়' এমন মানুষ ছিলেন। পুরুষরা ভাবতেন খোজারা তাঁদের পুরুষত্বকে চরম ঈর্ষা করেন। তবে পুরুষদের ওপর খোজাদের হামলার কোনও উদাহরণ পাচ্ছি না। কখনও কখনও খোজাদের বিনা কারনে শাস্তি দেওয়া হত। আওরঙ্গজেবের বোন, রওশানারা বেগমের হারেম থেকে দুই পুরুষকে প্রহরীরা ধরে; এই ঘটনায় বিশাল হইচই পড়ে যায় সে সময়। সবার ধারনা ছিল যে ওই দুই পুরুষ রওশানারা বেগমের অনুমতিতেই হারেমে প্রবেশ করেছেন। কিন্তু শেহজাদির নাম রক্ষা করতে প্রধান খাজাসিরাকে হারেম রক্ষায় গাফিলতির দায়ে অভিযুক্ত করা হয়। এই ঘটনাটি মানুচির লেখা থেকে জানা যাচ্ছে।

যৌন সংসর্গে অক্ষম হওয়ার সত্ত্বেও খোজাদের হারেমে প্রেম-ভালবাসার বিষয়ে বিশ্বাস করা হত না। টমাস রো লিখছেন, জাহাঙ্গীরের সময়ে এক শেহজাদি এবং এক খোজা চুমু খাওয়া অবস্থায় ধরা পড়েন। আবারও সাম্রাজ্যে হইচই বাধে। খোজা এবং শেহজাদির কেউই কঠিন শাস্তি থেকে রক্ষা পেল না। খোজাকে হাতির পায়ের তলায় ফেলা হয় এবং জল খাবার না দিয়ে একটি খাদে শেহজাদির হাত বেঁধে হাতটা সূর্যের রশ্মির দিকে মুখ করে রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়, যাতে অন্য কেউ পুরুষত্বহীন খোজাদের সঙ্গে শারীরিকভাবে লিপ্ত না হতে পারে। এই ঘটনা থেকে একথা না বলে থাকতে পারছি না, যৌনতা আঁটকানোর যে বিশাল সিস্টেম, তা যৌনতা আঁটকালো ঠিকই কিন্তু প্রেম বন্ধ করতে পারল না।

পৌরাণিক কাল থেকে চলে আসা খোজা ব্যাবসার পতন কবে ঘটল তাঁর কোনও সূত্র ইতিহাসের পাতায় পাওয়া যায় না। তবে উনবিংশ শতাব্দের উপনিবেশ আমল পর্যন্ত বাংলায় সীমিতভাবে হলেও দাস ব্যাবসা চলেছে। মুঘল সাম্রাজ্য ধ্বংস হলেও বাংলা, অবধ বা হায়দ্রাবাদের মত মুঘল পরবর্তী রাষ্ট্রগুলোয় দাস ব্যাবসা কমেছ এমন কোনও সূত্র পাওয়া যাচ্ছে না। তবে মুর্শিদাবাদে তুলনামূলক দাসের উপস্থিতি কম ছিল। আওয়াধের দরবারে খোজা দাসেদের উদাহরণ পাওয়া যাচ্ছে বহু ইউরোপীয় লেখায়। ১৮৫৬এর পর তাও বন্ধ হয়ে যায়।

ব্রিটিশ আমলের শুরুতে স্বাধীন রাষ্ট্রগুলো খোজাদের জমি, খাদ্যের অধিকার ও সামান্য অর্থ দিয়ে সাহায্য করত। কিন্তু ব্লাড-লাইন না থাকায় খোজারা ক্রমশ ব্রিটিশ শাসনে জমির অধিকার থেকে বঞ্চিত হল। মুঘল, নবাবি আমলের পর খোজা এবং তৃতীয় লিঙ্গের মানুষদের ক্ষমতার অলিন্দ থেকে সরিয়ে দেওয়া হল পরিকল্পিতভাবে।

ব্রিটিশ শাসনে খোজাদের অবস্থা মুঘল এবং নবাবি আমলের তুলনায় হেঁটমুণ্ডউর্ধ্বপদ হল। ইওরোরপিয় মুসাফিরদের বর্ণনা অনুযায়ী, ঔপনিবেশিক বিদেশি শাসকেরা বুঝে উঠতে পারেনি খোজা বা হিজড়াদের শাহি দরবারে এত গুরুত্ব কেন দেওয়া হচ্ছে।

উনবিংশ শতাব্দির দ্বিতীয় ভাগে খোজাদের অপরাধী হিসেবে দাগিয়ে দিয়ে তাঁদের অর্জিত মৌলিক অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়। আগেই আমরা দেখলাম কিভাবে তাঁদের থেকে জমির অধিকার কেড়ে নেওয়া হল। ব্রিটিশরা খোজা বা হিজড়াদের আলাদা জাতি বা উপজাতি (tribe) হিসেবে দেখত। ১৮৭১এ Criminal Tribes Act পাস হয় যার মাধ্যমে খোজাকরণ দণ্ডনীয় অপরাধ (দু'বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড বা জরিমানা বা দুই'ই) হিসেবে গণ্য হয়। খোজা বা হিজড়াদের যে স্বাভাবিক মানুষ, ক্ষমতাবান মানুষ হিসেবে দেখার যে চল ছিল উপনিবেশিক আমলে, সেই পরম্পরা ভেঙ্গে তছনছ করে তাঁদের অপরাধী আর অস্বাভাবিক মানুষ হিসেবে দেখার দৃষ্টিভঙ্গী উপমহাদেশজুড়ে ছড়িয়ে পড়ে। ব্রিটিশ উপনিবেশিকরা আমাদের গণতন্ত্র দিয়েছে বলে দাবি করে, সেটা আদৌ সত্য না সত্য নয়, সেটা বড় একটা বিতর্কের বিষয়; তবে একটা কথা পরিষ্কারভাবে ৩৭৭ শতাংশ গ্যারান্টি দিয়ে বলা যায়, উপনিবেশ ভদ্রবিত্ত ভারতবর্ষীয়দের মনে, জীবনে, সমাজে ট্রান্সফোবিয়ার ধারণাটা শেকড় চারিয়েছে।

অতিরিক্ত পাঠ

কালিকিঙ্কর দত্ত, শাহজাদা দারাশুকো
Gavin Hambly, A Note on the Trade in Eunuchs in Mughal Bengal
Shadab Bano, Eunuchs in mughal household and court
Shaun Tougher, The Eunuch in Byzantine History and Society
Almut Hofert, Matthew M. Mesley - Celibate and Childless Men in Power Ruling Eunuchs and Bishops in the Pre-Modern World
Jane Hathaway - The Chief Eunuch of the Ottoman Harem_ From African Slave to Power-Broker
Shreejita Basak, Aurangzeb's Eunuch Slave Bakhtawar Khan and His Passion for History
William Gervase ClarenceSmith, Eunuchs and Concubines in the History of Islamic Southeast Asia

১৭৭০/১১৭৬ গণহত্যা গবেষণা আন্দোলন ।। জনভাণ্ডার ।। অপ্রাতিষ্ঠানিক গবেষণা উদ্যম।। বই প্রকাশ পরিকল্পনা।। গ্রন্থাগার প্রকল্প

জনদানে প্রকল্প পরিচালনা

১। ১৭৭০ এবং...
মিল্টন বিশ্বাস এবং দেবোত্তম চক্রবর্তী সম্পাদিত
প্রকাশিতব্য বইমেলা '২৪এর পরে

আপাতত লেখা দিয়েছেন - ক। অনুপম পাল পলাশী পূর্বের কৃষি ব্যবস্থা এবং পলাশীর পরের উপনিবেশিক চাষ কাঠামোর বিস্তার ।। খ। নারায়ণ মাহাত পলাশীর পর জঙ্গমহলের স্বাধীনতা সংগ্রাম [চিকিৎসা ব্যবস্থার জ্ঞানচর্চা বিষয়ে আরও একটি লেখা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন] ।। গ। প্রণব ভট্টাচার্য বাঙ্গলার ইতিহাসের এক বিস্মৃতপ্রায় অধ্যায় ছিয়াত্তরের মন্বন্তর এবং কারিগরদের দুর্দশা ।। ঘ। নয়ন তানবিরুল বারি যে কারণে ফুলপুর কবরস্থানে দাফন করেনা কেউ ।। ঙ। বিকাশ এস. জয়নাবাদ রাঢ় বাংলা - বর্গি আক্রমণ থেকে ছিয়াত্তরের গণহত্যা [বিকাশ এস. জয়নাবাদ দাদা স্বাধীনতা সংগ্রাম নিয়ে একটি লেখা দেওয়ার ।। প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন] ।। চ। বিশ্বেন্দু নন্দ পলাশীর প্রভাবে মেয়েরা অন্তরীণ হলেন, রোজগার আর সম্পত্তির অধিকার হারালেন - একটি সাধারণ ধারণা ।। ছ। ১০০০ বছর বাংলায় ছোটলোক-ভদ্রলোক দ্বন্দ্ব ইতিহাস ।।
ব্যয় আনুমানিক ৭০,০০০ টাকা

২। টেগোর ল্যান্ড ঠাকুর কলোনি প্রকল্প
গবেষণা নেতৃত্ব অত্রি ভট্টাচার্য এবং সাজাহান আলি

রবিবাবুর শিক্ষা চিন্তায় উপনিবেশিক ভদ্রবিত্তীয় প্রদূষণ এবং তিনি যে জ্ঞান আর শ্রমের মিলিত শিক্ষাব্যবস্থা চালু করার চেষ্টা করেছিলেন নিজের ছেলে আর লক্ষ্মীশ্বর সিংহকে বিদেশে পাঠিয়ে, শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ করে, সেই প্রক্রিয়াকে সাবোতাজ করার ইতিহাস আমরা খুঁজছি। নব্য শান্তিনিকেতনি ভাবনাচিন্তার বিরোধিতার কেন্দ্রে আছেন স্যর যদুনাথ সরকার - তিনি ব্রিটিশ আঙ্গিক অনুসরণে শান্তিনিকেতনের শিক্ষা ব্যবস্থার গোটা ভাবনাকে উড়িয়ে দিচ্ছেন। মূলত কয়েকটি বিখ্যাত শান্তিনিকেতনি আশ্রমিক পরিবার রবীন্দ্রনাথকে ঠাকুর বানিয়ে যদুনাথ সরকারের ভাবনাকে সামনে রেখে ভদ্রবিত্ত উপনিবেশিক শিক্ষা কাঠামো শান্তিনিকেতনে চাপিয়ে দিয়েছে এবং শিক্ষা ব্যবস্থাকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে নামিয়ে আনার উদ্যম নিইয়েছে যাতে তাদের সন্তানেরা চাকরি করার সুযোগ পায়। এক বিখ্যাত পত্রিকা সম্পাদক রবীন্দ্রনাথকে সামনে রেখে কেজি টু পিজি প্রকল্প চালু করেছেন এবং এটা ১৯৪১এর পরে উদ্দাম গতিতে চলেছে, দেশজ মানুষকে উচ্ছেদ করে, তাদের ওপর পরজীবি ভদ্রবিত্তের উপনিবেশ চাপিয়ে দিয়েছে, ঘেটোয় থাকতে বাধ্য করেছে, মিউজিয়ামের মত খোয়াইয়ে হাটে তাদের শোকেস করাচ্ছে। আমাদের কাজ এই সব অভিচারের মূলে পৌঁছনোর।
সময় লাগবে ৮ থেকে ১০ মাস।
আনুমানিক ব্যয় ১ লক্ষ ৫০ টাকা

৩। হকার ব্যবস্থা নিয়ে প্রকল্প
গবেষণা নেতৃত্ব বহ্নিহোত্রী হাজরা, অত্রি ভট্টাচার্য

রেল হকার, পথ হকার নিয়ে অনেকগুলো সমীক্ষা। একটা সমীক্ষা অপ্রচলিত পত্রিকায় প্রকাশিত। শক্তিমান ঘোষের সাক্ষাৎকার নেওয়া চলছে। অন্তত ৩টে বইএর পরিকল্পনা।
সময় ১ বছর
আনুমানিক ব্যয় ২ লক্ষ টাকা

৪। ক্যাডার কয়েদি
গবেষণা নেতৃত্ব অত্রি ভট্টাচার্য

স্বাধীনতা আন্দোলন থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত ক্রমিকভাবে কেবলমাত্র রাজনৈতিক কর্মীদের ইতিহাসকে কেন্দ্র করে কোনো সংকলন তৈরী হয়নি। তাই এই সম্পাদিত সংকলনের পরিকল্পনা - যাতে একইসঙ্গে, অনুবাদ, পুনর্মুদ্রণ, এবং সাক্ষাৎকার থাকবে। সংকলনটির মূল উদ্দেশ্য কমিউনিস্ট চিরকালীন অসুখ/সমস্যা/আমলাতন্ত্র, ভদ্রলোকামি, তথাকথিত 'নিচুতলার' কথা না শুনে, নিজেদের কেন্দ্রীয় কমিটির/ পলিটব্যুরোর বক্তব্য চাপিয়ে দেওয়া [গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতা], এবং সেই সিদ্ধান্তগুলির পরিণতি হিসাবে বাম-অবাম-আন্দোলনের অবক্ষয়কে চিহ্নিত করা। সর্বোপরি সিপিআইএম, সিপিআই ও নকশালগোষ্ঠী, ট্রটস্কিপন্থী, গান্ধীবাদী, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ'র কিছু জীবিত পুরাতন কর্মীর বয়ান নথিভুক্ত করা- যাতে ক্রনোলজিক্যালি নেতৃবৃন্দের দৃষ্টিতে নয়, কর্মীদের চোখে বাংলায় বামআন্দোলনের ইতিহাসকে- বৈশ্বিক ও জাতীয় পরিপ্রেক্ষিতে আজ পুনরায় বিবেচনা করা এই সংকলনটির মূল উদ্দেশ্য হবে।

৫। বাংলার সূচি আর বয়ন শিল্পের ইতিহাস
গবেষণা প্রধান কারিগর মহুয়া লাহিড়ী

বাংলার সূচি আর বয়ন শিল্পের ইতিহাস লেখার কাজ নিয়ে এগোচ্ছেন। লেখা এগোচ্ছে। নতুন কিছু সূত্র পেয়েছেন। সেই সূত্রগুলো নিয়ে আরও কাজ করা দরকার। উনি কলকাতা থাকা কালীন একবার দুবার বৈঠক হবে।

৬। বৃহত্তর বাংলার হাট ব্যবস্থা সমীক্ষা
গবেষণা নেতৃত্ব দেবেন বহ্নিহোত্রী হাজরা

কারিগর ব্যবস্থার অবস্থা আর কর্পোরেট আগ্রাসন বুঝতে পশ্চিমবঙ্গ আর বাংলাদেশ হাট ব্যবস্থা সমীক্ষা। পশ্চিমবঙ্গের চারটে ভৌগোলিক অঞ্চল রাঢ় বাংলা, গাঙ্গেয় উপত্যকা, মধ্য বঙ্গ এবং তরাই অঞ্চলের মোট ১০ হাট। বাংলাদেশেরও মোট ১০টা হাট।
সময় অন্তত ১ বছর, হয়ত আরও একটু বেশি
প্রকল্প ব্যয় ১,০০,০০০

৭। মন্দির গবেষকদের কাজের নথিকরণ আর হুগলীর টেরাকোটা মসজিদ মাজার সমীক্ষা
এই মুহূর্তে মন্দির/মাজার গবেষক আছেন, তাদের কাজগুলোকেই নথিকরণ করা হবে।
ইন্দ্রনীল মজুমদারের নেতৃত্ব

৯। গ্রন্থাগার প্রকল্প
৪ হিদারাম ব্যানার্জী লেনে গ্রন্থাগার চালু হয়েছে। মঙ্গল, বৃহস্পতি শনি খোলা

দান দেওয়ার জন্যে
জ্ঞানগঞ্জ অছি সবে নথিবদ্ধ হয়েছে, ব্যাঙ্কএকাউন্ট হয় নি।
আপাতত আমরা বন্ধু কারিগর সংগঠন কলাবতী মুদ্রার অছিতে দান নিচ্ছি।

Kalaboti Mudra,
Bank of India, J N Road Branch,
A/C - 402620110000228, IFSC - bkid 0004026